Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা ফাইজা রিফা

রোলঃ 228020097

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা ফাইজা রিফা

রোলঃ 228020097

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা ফাইজা রিফা, আইডিঃ 228020097 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

ফাহমিদা ফাইজা রিফা

আইডিঃ 228020097

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সূচিপত্র v

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য 5

মুসলিম উম্মাহ'র এক্যহীনতার কারণ 5

মুসলিম উম্মাহ ‘'র পরিচিতি ও প্রকৃতি 6

বিভেদ একটা বাস্তবতা -ঐক্য অপরিহার্য 8

বিভেদের স্বরূপঃ 8

বিভেদের কারণ সমূহ 9

ইসলামে জ্ঞান বা ইলমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট 10

ইলমের সংজ্ঞা 12

ইলমের বৈশিষ্ট 14

ইসলামী ইলমের দ্বিতীয় বিশিষ্ট। 15

ইসলামী ইলমের উৎস 16

ইলম আমল, তাযকিয়া ও হিকমত 18

আল্লাহর আয়াত বা তার নিদর্শন 19

কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা 20

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি 21

বিভেদের আবকাশ ও আল্লাহর হিকমত 22

তাযকিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় 26

(৩) বিভেদের তৃতীয় কারণঃ 36

নফসের গোলামী বা মনোবৃত্তির দাসত্ব 36

বিভেদের চতুর্থ কারণঃ 44

অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজের গোলামী। 44

বিভেদের পঞ্চম কারণঃ পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ..45
(কাফিরদের ষড়যন্ত্র 46
ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব..56
হাদিসের আলোকে মুসলিম উম্মাহ ‘র ঐক্য..60
ঐক্যের পথে আসল বিপদ 62
মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল..68
মাযহাব কী?..86
তাকলিদের স্বরুপ..88
ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি...92
বিভেদ থেকে মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা।...106
মূলনীতি বাস্তবায়নে সাহাবাদের ভূমিকা 110
বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপ 114
মুজাদ্দিদে দ্বীনের ভূমিকা: 123

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাথেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও।(আল ইমরান১০৩)

মুসলিম উম্মাহ'র এক্য' হচ্ছে- আজকের বিশ্বে খুবই স্পর্শকাতর ইস্যু। এটা এমন স্পর্শকাতর যে, মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্য বক্তব্যাগুলো এতো স্পর্শকাতর নয়। সামান্য কয়েকজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, কুরআন না বুঝে পড়লেও চলবে; তবে অধিকাংশ মনে করেন অর্থ বুঝে পড়তে হবে। সামান্য কিছু মুসলিম মনে করে যে, দাওয়াহ না দিলেও চলবে; তবে অধিকাংশ মুসলিম মনে করেন দাওয়াহ অপরিহার্য। তবে মুসলিমদের মধ্যে একতা' টপিক্সটি খুবই স্পর্শকাতর। এ টপিক্সটার সাথে আমরা সকল মুসলিমই জড়িত আছি। সেজন্য বলছি এটা স্পর্শকাতর। তাই আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনারা সবাই আমার এই বক্তব্যটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ইনশাআল্লাহ এতে আপনাদের উপকার হবে আর ধর্মেরও সত্যিকার চিত্রটা ফুটে উঠবে।

মুসলিম উম্মাহ'র এক্যহীনতার কারণ

মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে এক্য বা একতা না থাকার নানাবিদ কারণ রয়েছে। তবে প্রধান যে কারণে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে একতা নেই তা হচ্ছে- আমাদের মধ্যে এখন অনেক সম্প্রদায়। এছাড়া মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে অনেকগুলো মতবাদ প্রচলিত আছে; যাকে মাযহাব, মাছলাক অথবা মুছাল্লাক নামে আখ্যা দেওয়া যায়।

মুসলিম উম্মাহ ''র পরিচিতি ও প্রকৃতি

কোরআনের পরিভাষায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উম্মাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কতকগুলো মূলনীতির ভিত্তিতে যে জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদেরকে বলা হয় উম্মাহ।

মানব সমাজের উপর আল্লাহর প্রভূত্বের শৃংখল চাপিয়ে মানুষের বিচিত্র গোলামী থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আল্লাহর নবীরা প্রেরীত হয়েছেন, তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। সেই ঐক্যবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে কোরআনের ভাষায় উম্মাহ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমস্ত নবীদের অনুসারীদের সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ বিশ্বের আদিকাল হতে অন্তকাল পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষেরা তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বা করবে তারা সবাই এই উম্মাহর সদস্য। কিন্তু যেহেতু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পর পূর্বতন সকল শরীয়ত পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তাই আজকের মুসলিম উম্মাহ বলতে আমরা শেষ নবীর অনুসারীদের বুঝবো।

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যক্তি সত্বায়, তাঁর মিশনে ও সাফল্যে, তার উপস্থাপিত আদর্শের ব্যাপকতায় ও কার্যকারিতায় এবং তার নবুয়তি জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সর্বশ্রেষ্ট, তাই তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন। পক্ষান্তরে তিনি মানবিতিহাসের সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তার উপস্থাপিত দ্বীন ও শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তাই তাঁর অনুসারীগণ বা আজকের মুসলিম উম্মাহ মর্যাদায় ও দায়ীত্বে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ। এই শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হলো মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে জাতি বলা হয়, উম্মাহ তার সমার্থক নয়। ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে একটা জাতি গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে সুনিদ্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা উম্মাহর প্লাট ফরমে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ও অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা বা তথাকথিত অভিন্ন স্বার্থের টানা-পোড়নে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী অভিন্ন আদর্শে একাকার হয়ে যায়।

অনেকগুলো ইউনিটের সমন্বয়ে সমষ্টি গঠিত। ইউনিটগুলোর শুধু সংখ্যাধিক্যে নয় বরং সতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটের গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বেই শ্রেষ্ঠতর সমষ্টি গড়ে উঠে। যেমনি

মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন ছাড়া সতন্ত্রভাবে ইউনিটগুলো কোন সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে না, যদিও
তারা সতন্ত্রভাবে গুণগত মানদন্ডে উন্নত হয়। তেমনি গুণগত মানদন্ডে অনুন্নত ইউনিট গুলোর ঐক্যবদ্ধ সমষ্টি কাংখিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংখ্যার স্বল্পতা ও গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বে মহীয়ান হয়ে যায়। কিন্তু গুণগত মানের অবনতির কোন বিকল্প নেই। তাই ব্যক্তির মানেই সমষ্টির মানোন্নয়ন। সামষ্টিক মূল্যবোধের নিরিখেই ব্যক্তিমান উন্নত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির এই সমন্বিত উন্নয়নই হলো ইসলামী ঐক্যের ফসল। কোরআনে এই সমন্বিত চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মুসলিম উম্মাহর বিন্যাসে।

আরবের শতধাবিচ্ছিন্ন বেদুঈন সমাজে যখন নুন্যতম মানবীয় মূল্যবোধও চরমভাবে পদদলিত ছিলো। ব্যক্তি চরিত্রের চরম অবনতি ঘটেছিলো। ঐক্যবদ্ধ মানবীয় মূল্যবোধের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখন আল্লাহর নবী সমাজের ঐ সমস্ত লোকদের নিয়েই গড়ে তুলেছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ। মূলনীতির প্রতি অটল বিশ্বাসে, ব্যক্তি চরিত্রের চরম বিকাশে, পারস্পারিক আস্থা প্রতিষ্ঠা করে পারস্পারিক সহানুভূতি ও সহযোগীতায়, আত্মসম্মান ও ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামষ্টিক স্বার্থের লক্ষ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জনের অনুভূতি সৃষ্টিতে, কাংখিত মানবীয় গুণাবলীর চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধনে তথা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে মানবেতিহাসের চরম ও পরম গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়।

ইতিহাসের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চৌদ্দশত বছর পরেও ইসলামী ঐক্যের মূলনীতি অবিকৃত রয়েছে। মহানবীর শিক্ষাভান্ডার ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর পথ নির্দেশে ভাস্কর হয়ে আছে। কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মার বাস্তব অবস্থা ভিন্ন রূপই তুলে ধরে।

আজ সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা ১৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। পাক-বাংলা-ভারতীয় উপমহাদেশেই মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি। এই বিপুল সংখ্যা উম্মাহর শক্তিতে সহায়ক হতে পারছে না। এর মূল কারণ হলো পরম কাংখিত ঐক্যের অভাব। আকিদা-বিশ্বাসে ও কর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তারা বিভিন্ন দলে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে, রাসুলের রিসালতে ও আখিরাতের বিশ্বাস ও এক কাবাকে কিল্লাহ মানার ঐক্য থাকা সত্বেও মুসলিম উম্মাহ শতধাবিচ্ছিন্ন। ইসলামী ভাতৃত্বের অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত। দলাদলী, সংঘর্ষ, মারামারি, কুৎসা, ফতোয়াবাজী ও দলীয়

কোন্দল মুসলিম মানসে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদের বিষক্রিয়া হিসেবে অনেকে ইসলামী অনুশাসন থেকে দূরে সরে গেছেন, আবার অনেকে এই বিভেদের ব্যাপকতায় হতাশ হয়ে বিভেদকেই চরম বাস্তবতা বলে মেনে নিয়ে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করেছেন। এ'দুটোই নেতিবাচক চিন্তা ও মূলতঃ সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অভাবেরই ফসল।

বিভেদ একটা বাস্তবতা -ঐক্য অপরিহার্য

বিভেদের স্বরূপঃ

মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধরনের বিভেদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) ইসলামের মূল আকিদা ও বিশ্বাসে বিভেদ।

এই ধরনের বিভেদ ঈমানের পরিপন্থি। যারা এই বিভেদের অপরাধে অপরাধী তারা মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(২) ইসলামের মূল আকিদার শাখা-প্রশাখায় বিভেদ। এই ধরনের বিভেদ প্রথমতঃ ঈমানের পরিপন্থি বলে মনে না হলেও পর্যায়ক্রমে মূল আকিদা ও বিশ্বাসকে দূর্বল করে ফেলে। ফলে ইসলামী ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) আকিদা-বিশ্বাসে নয়, বরং শরীয়তের প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিভেদ। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগে কিংবা নীতিমালার প্রয়োগ পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ে বিরোধ। ফিকাহর বিভিন্ন মতামতও এই পর্যায়ের বিভেদ। এই মত পার্থক্য বিভেদ পর্যায়ভূক্ত নয়। এটা শুধু নির্দোষই নয় বরং কল্যাণকর ও অপরিহার্য।

(৪) আচার অনুষ্ঠান ও রসম-রেওয়াজের বিভেদ। এই বিরোধ মূলতঃ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে সৃষ্টি হয়। ইসলামের সঠিক জ্ঞান বা কোরআন-হাদিসের জ্ঞানের সম্প্রসারণই এই ধরনের বিরোধের নিরসন করতে পারে।

(৫) ইসলামের সীমার লংঘন না করে কিছু নবতর সংযোজন, যা প্রথমতঃ আদৌ বিভেদ মুলক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে জাহেল ও স্বার্থপর লোকদের দ্বারা বিভেদের রূপ ধারণ করেছে।

এই বিরোধ নিরসনে সংস্কার মুলক সাহসিক আন্দোলন অপরিহার্য।

মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই শ্রেনীবিন্যাসের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস ও উপরোক্ত শ্রেনীবিন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা পরিবর্তী পর্যায়ে আসবে।

বিভেদের কারণ সমূহ

যে সমস্ত মৌলিক কারণগুলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-বন্ধনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে- ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত সার এখানে উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে এই সব কারণগুলোই মূলতঃ আমাদের পূর্বতন দুইটি জাতির মধ্যেও বিভেদের মূল কারণ ছিলো; সেগুলো হলো;

(১) ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(২) মানুষের জ্ঞান যে সব অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সমাধান করতে ব্যর্থ। সেই সব বিষয়কে গবেষনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা।

(৩) মনোবৃত্তির দাসত্ব।

(৪) রীতি-নীতির গোলামী ও অন্ধ অনুকরণ।

(৫) পারস্পারিক অনাস্থা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দাসত্ব।

(৬) চিন্তা ও কর্মের বিরোধ।

উপরিল্লিখিত মূল মূল কারণগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু আনুসাঙ্গিক কারণ সমূহ আলোচনায় আসবে যথা সময়ে। এই সব কারণগুলোর তাত্বিক আলোচনার পর ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের পর্যায়ক্রমিক আলোচনার মাধ্যমে বিভেদের সুত্রগুলো খুঁজে বের করার প্রয়াস পাবো।

ইসলামে জ্ঞান বা ইলমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট

কোরআনে মজিদের সর্বপ্রথম যে আয়াতটি আমাদের প্রিয় নবীর উপর নাযিল হ'য়েছিলো, তা হলো;

الذي علم إقرأ بأسم ربك الذي خلق - خلق الانسان من علق - إقرأ وربك الأكرم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم - (العلق) (পাঠ কর তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর, এবং তোমার রব পরম দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা তারা জানতো না)

এখানে জ্ঞান অর্জনের আহবান জানানো হয়েছে, অজানাকে জানতে উদ্বৃত করা হয়েছে পড়া ও লিখার মাধ্যমে। হাদিসে এরসাদ হয়েছে,

(জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো)

اطلب العلم من المهد الى اللحد

من خرج في العلم فهو في سبيل الله

(যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়)

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة

(যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ধাবমান হয়, আল্লাহ তার জন্যে বেহেশতের পথ সুগম করে দেন)

فضل العلم على العابد كفضلي على ادناكم -ان الله و ملئكته و اهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها و حتى الحوت ليصلون

على معلمى الناس الخير - (الترمذى(

(আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি যেমন তোমাদের সাধারণ মানুষদের উপর আমার শেষ্ঠত।

(আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি যেমন তোমাদের সাধারণ মানুষদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব।

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফিরাস্তারা, আসমান, যমিনের অধিবাসীরা, পিপড়া তার গর্ত থেকেও মাছ পর্যন্ত মানুষের শিক্ষকদের প্রতি কল্যাণ কামনা করে)

এমনি ধরনের অসংখ্য আয়াতে ও হাদিসে জ্ঞানের মহিমা তুলে ধরা হয়েছে। এই ইলমের কারণেই ফিরিস্তাদের উপর হযরত আদমকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

অপর একটি হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على الخير و احدهما افضل من صاحبه - اما هولاء فيدعون الله ويرغبون اليه ، فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم و اما هولاء فيتعلمون العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل و انما بعثت معلما

فجلس فيهم

(একদা আল্লাহর নবী তাঁর মসজিদে তশরিফ আনলেন, তখন মসজিদে দুইটি দল

বসেছিলো, একটি দল জিকির-আযকারে লিপ্ত ছিলো, অন্য দলটি জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানদানে ব্যস্ত ছিলো। আল্লাহর নবী বললেন, দুইটি দলই ভাল কাজে লিপ্ত রয়েছে, তবে একটি দল অপর দলটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যে দলটি জিকির-আযকারে লিপ্ত, আল্লাহ মর্জি হলে তাদের প্রতিদান দেবেন। ইচ্ছা না হলে দেবেন না। পক্ষান্তরে অপর দলটি দ্বীনের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানদানে

ব্যস্ত। তারা মূর্খদেরকে জ্ঞানদান করছে। তারাই শ্রেষ্ঠ। আমিও শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে পড়লেন)

ইসলামের জ্ঞানকেই আসলে জ্ঞান বলা হয়, এ জন্যে ইসলাম পূর্বযুগ কে (ايام الجاهلية) মূর্খতার যুগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনের ইলম ছাড়া এই দ্বীনের সত্যিকার অনুসরণ সম্ভব নয়।

ইলমের সংজ্ঞা

কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানকে ইসলামে ইলম বলা হয়। জাহেলিয়াতের

মূল্যবোধের প্রতি গোঁড়া রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে স্বেচ্ছায় ইসলামের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করে নিলেই কোন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাতের সদস্য হয়ে যায়। এমনি স্বেচ্ছাকৃত স্বীকৃতি ছাড়া গতানুগতিক ও বংশ পরম্পরায় মুসলিম বলে পরিচিত হবার কোন দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাহেলী চিন্তাধারারই ফসল। কাজেই ইসলামী জীবনাদর্শকে না বুঝে কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীকৃতির ঘোষণার কোন অর্থ হয় না। এই দিক দিয়ে ইসলাম জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার আদর্শ। কোরআন ও হাদিসের ভিত্তি ছাড়া কোন জ্ঞানের মূল্য নেই। এই ভিত্তি ছাড়া মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তার ফসলকে ইসলাম জ্ঞান বলে স্বীকার করে না। বরং তা হলো চরম মূর্খতা। ইহুদীবাদ

বা খৃষ্টবাদ যার আধুনিক পরিভাষা হলো পাশ্চাত্যবাদ, যে সব চিন্তাধারাকে আধুনিক চিন্তাধারা বলে চালু করেছে, ইসলাম অনেক পূর্বেই তাকে মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছে। কোরআনে মজিদে ঐ জাহেলী চিন্তাধারাকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

إن هي الا حياتنا الدنيا و ما يهلكنا الا الدهر - الجاثية(٢٤)

(জীবন তো শুধু এই জগতের (আমরা জীবিত হই ও মৃত্যু বরণ করি), মহাকাল ছাড়া আমাদের কেউ মৃত্যু দেয় না।)

এখানে প্রকৃতি (Nature) বা জড়বাদী চিন্তাধারার মূল দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। আজকের আধুনিক খোদাহীন বস্তুবাদী জীবন দর্শন মূলতঃ কোন নতুন জীবনএখানে প্রকৃতি (Nature) বা জড়বাদী চিন্তাধারার মূল দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। আজকের আধুনিক খোদাহীন বস্তুবাদী জীবন দর্শন মূলতঃ কোন নতুন জীবন দর্শন নয়। বরং জাহেলী যুগের ঐ প্রাচীন চিন্তাধারারই নব্য সংস্করণ। যাকে কোরআন মজিদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাহেলী চিন্তাধারা বলে আখ্যায়িত করেছে।

তাই ইসলাম যাকে জ্ঞান বলে স্বীকার করে তার একটা স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট আছে। হাদিস শরিফে এরসাদ হয়েছে;

عن الحسن رضى الله عنه قال العلم علمان ، فعلم في القلب فذاك علم نافع و علم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن أدم-

হযরত হাসান বলেছেন, ইল দু'ধরনের, এক ধরণের ইলম যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে যা হ'লো উপকারী ইলম (পৃথিবীতে হকের উপর টিকে থাকতে ও আখেরাতে কাজে আসবে) আর অপর একটি ইলম রয়েছে যা মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় মাত্র। এই ইলম বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ এই বলে পাকড়াও করা হবে যে তুমি তো বুঝতে, তুমি তো জানতে, তবু কেন হকের পথে চলোনি?

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - (متفق عليه(

আল্লাহপাক যাকে উত্তম কিছু দান করতে চান তাকে দ্বীনকে বুঝবার ক্ষমতা দান করেন। সত্যিকার জ্ঞান শুধুমাত্র জ্ঞানের ধারকের জন্যেই নয় বরং মুসলিম উম্মাহ তথা সমগ্র মানুষের জন্য কল্যাণের উৎস। এই জ্ঞান যতদিন বিদ্যমান থাকবে হকপন্থী মানুষও পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

ইলমের বৈশিষ্ট

কোরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান, অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা ছাড়া সত্যিকার জ্ঞানার্জন হয় না। সাহাবায়ে কেরামদের যামানায় তারা কোরআনের অর্থ ও মর্ম আল্লাহর নবীর কাছেই শুনতেন। আরবী ভাষার জ্ঞান থাকা সত্বেও তারা নিজেদের তরফ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন না। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে হযরত ইবনে আব্বাসের মত আরবী ভাষার পন্ডিত ও বিশিষ্ট সাহাবীও শুধুমাত্র সুরা বাকারাহ ও আল ইমরান অধ্যয়ন করতে দীর্ঘ ৮টি বছর লাগিয়েছিলেন। অতঃপর তারেযী যামানায় তারা ঐ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতেন যা সাহাবাদের দ্বারা বর্ণিত। পরবর্তীকালে ইমামদের জীবনে ও আমরা একই দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই। তারাও সাহাবাদের ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিতেন, অর্থাৎ তারা সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাখ্যাকেই নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে;

لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل أكابرهم فاذا اتاهم من اصاغرهم هلكوا -যতদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে বড় বড় উলামাদের ইলম থাকবে তারা দ্বীনের ব্যাপারে হকের উপর থাকবে। আর যখন অজ্ঞ ও নিম্নমানের (আলেম নামধারী) লোকদের তরফ থেকে ইলম আসা শুরু হবে, তখন তারা ধ্বংশ হয়ে যাবে। 'বড় বড় আলেম ও নিচুমানের লোক' কথাটি সুস্পষ্ট। সর্বযুগে ও সর্বকালের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য। হযরত ইবনে মোবারক ও আবু উবায়দা উঁচুমানের আলেম থেকে সাহাবা ও নিচুমানের লোকের অর্থ পরবর্তীকালের আলেম বলে বুঝেছেন। নিচুমানের লোকদের তরফ থেকে ইলম আসার অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরামদের ইলমের তুলনায় পরবর্তীযুগের উলেমাদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া। এই বিশেষ ব্যাখ্যাটিও সাধারণ মুহম্মদ বিন সিরিন একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তাঁকে হজ্ব সম্পর্কে একটা মসলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেই বিষয়ে সাহাবাদের মতামতকে গ্রহণ করে মন্তব্য করেন।

كرهها عمرو عثمان فان يكن علما فهما أعلم منى و ان يكن رايا فرايهما أفضل -(হযরত উমর ও উসমান এটাকে মাকরুহ মনে করতেন, তারা যদি হাদিসের ভিত্তিতে বলে থাকেন তবে তারা আমার চাইতে বেশী জ্ঞানী, আর যদি নিজেদের চিন্তা থেকে বলে থাকেন, তবু তাদের চিন্তা আমার চিন্তার চাইতে উন্নত।)

অর্থাৎ সাহাবাদের মতামত অপরাপর জ্ঞানীদের মতামতের তুলনায় অগ্রগন্য, দ্বীনের অবিকৃত জ্ঞানের উৎস সন্ধানে সাহাবীদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে সাহাবাদের মতামত অনুপস্থিত সেখানে কোরআন ও সুন্নাতভিত্তিক ফয়সালা করার হক পরবর্তি উলেমাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামী ইলম ও আমলের কষ্টিপাথর হচ্ছে রাসুলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের ইলম ও আমল।

ইসলামী ইলমের দ্বিতীয় বিশিষ্ট।

ইলম অবশ্যি আমলের পথে উদ্বুদ্ধ করবে। আমল ছাড়া ইলমকে ইসলামে নূরহীন ইলম বলা হয়েছে। বে আমল আলেমকে 'আলেমে সু' বা মন্দ আলেম বলা হয়েছে। সে ইলম মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে তা ইসলামের শত্রুদের উপকারে আসে। ইসলামের ইতিহাসে যত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলেও রয়েছে এই ধরনের ইলম। এই ধরনের ইলম সংখ্যাগত দিক দিয়ে অনেক বেশী কিন্তু গুণগত মানের দিক দিয়ে মূল্যহীন। এই ইলম সম্পর্কেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে হাদিস শরীফে।

لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق

عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا - (متفق عليه) (আল্লাহপাক আকস্মিকভাবে ইসলামের ইলম পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং একে একে সত্যিকার আলেমদের উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর যখন সত্যিকার আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন লোকেরা জাহেল লোকদেরকে আলেম বলে মেনে নেবে। তারা দ্বীনের ব্যাপারে মতামত দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে। অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে)

সঠিক ইলমের অধিকারী ব্যক্তি গোমরাহ হতে পারে না। তার ইলম তাকে আমলের পথে নিয়ে আসবেই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলেম বলে মনে হলেও যারা সত্যিকার অর্থে আলেম নয়, তারাই বিভেদের উৎস।

ইসলামী ইলমের উৎস

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরিভাবে অর্জিত জ্ঞানই সত্যিকার ইলম। 'অন্যান্য বই পুস্তক সহায়ক শক্তি মাত্র। কিন্তু সত্যিকার শক্তি সরাসরি কোরআন ও হাদিসের কিন্তু সত্যিকার শক্তি সরাসরি কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান থেকেই আসবে। এ জন্যে কোরআনের ভাষা আরবী সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমানে দখলও থাকতে হবে। আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া কোরআন হাদিসের সত্যিকার অর্থ বোঝা অনেকটা অসম্ভব। এই ভাষার জ্ঞান ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিপুল জ্ঞান ভান্ডার নাগালের বাইরে থেকে যায়। দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হবার জন্যে ঐ সব জ্ঞান অপরিহার্য।

অর্থাৎ বস্তুগত ও মানগত দিক দিয়ে সত্যিকার আলেম হতে হবে। এই ধরনের ইলম কখনও ফিতনার উৎস হয় না। কিন্তু যখনই তার একটা বাহু হারিয়ে ফেলে, সেই ইলম উম্মাহর জন্য রহমত না হয়ে অভিশাপ ডেকে আনে।

এই কথাগুলোর অর্থ এই নয় যে ইলমের মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হলে ইসলাম বুঝবার বা আমল করার উপায় নেই। বরং আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো এই পর্যায়ের ইলম অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। যার সাহায্যে উম্মতে মুহম্মদী সিরাতুল মুস্তাকিমের লক্ষ্যে নির্দেশনা পাবে।

ইমাম মালেক বলেছেন;

ليس العلم بكثرة الرواية و لكنه نور يجعله الله فى القلوب-

(বেশী পরিমানে জানার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হলো একটা নূর যা আল্লাহপাক অন্তরে সৃষ্টি করেন)

এই ইলমের নিদর্শন তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন;

و لكن عليه علامة ظاهرة و هو التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود- (ইলমের প্রকাশ্য নিদর্শন এই যে সত্যিকার ইলমের ধারকরা পার্থিব দুনিয়ার স্বার্থকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতের জীবনের প্রতি মনযোগী হয়ে পড়ে)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন;

"হে উলামা সমাজ তোমরা ইলমের উপর আমল করবে, তারাই সত্যিকার আলেম যারা ইলম হাসিল করার পর সেই মোতাবেক আমল করে, তার ইলম ও আমল সমন্বিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে এমন ধরনের আলেম তৈরী হবে যারা ইলম লাভ করবে, কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর বাইরের বিরোধী হবে। তাদের ইলম তাদের আমলের পরিপন্থি হবে। তারা দলবল নিয়ে জমিয়ে বসবে এবং এক অপরের উপর গর্ব করবে। এমন কি তারা তাদের সাগরেদদের মধ্যে কারো কারো প্রতি এ জন্যে নারাজ হবে যে তারা তার মাদ্রাসা ছেড়ে অন্যের কাছে গিয়ে ইলম হাসেল করেছে। এরাই তারা যাদের তওবা কবুল হবে না।"

হযরত সুফিয়ান সাউরী বলেছেন;

"যখন সত্যিকার ইলম আসে, তা আমলের প্রতি আহবান জানায়, যদি আমলও আসে তখন ইলম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অন্যথায় বিদায় নিয়ে যায়।" হযরত হাসান বলেছেন, যিনি ইলমে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন, তাকে আমলেও শ্রেষ্ঠ হতে হবে।

ইলমের সাথে আমলের এই সম্পর্ক ব্যাপকতর। ইলমের সকল দিক ও বিভাগই আমলের দাবিদার। কোন সে আমলের মধ্যে আনা ও কোন কোন ইলকে আমলের বাইরে রাখার জীবনে আমরা আপোষহীন চরিত্রের স চাশ নেই। এ জন্যে বরেণ্য মনিষীদের ২। তারা ইলমের দাবী অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, কিন্তু ইলমকে আমলের উর্দ্ধে রাখেননি।
মানব জীবনের কোন কোন দিক ও বিভাগের ইলমকে আমলে রূপান্তরিত না করলে একাধারে দুইটা অপরাধ সংগঠিত হয়। একদিকে সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হয়। অপরদিকে ইলমের সাথে আমলের স্ববিরোধিতার অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি কোন আলেম নামাজ, রোজা বা অন্যান্য জিকির আজকার সংক্রান্ত তার ইল্মের হক আদায় করলেন কিন্তু মানুষের, সমাজের, রাষ্ট্রের ব্যাপকতর হক আদায়ে তৎপর না হন তবে উপরোক্ত দুইটি অপরাধের অপরাধী হবেন। সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক ইলমকে গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবেন। সত্যিকার ইসলামী ইলম সেটাই যা সার্বিকভাবে আমলে রূপান্তরিত হয়। কোন দিকই আত্মগোপন করে থাকে না। সাহাবায়ে কেরামগণ বা পরবর্তীকালের বিশিষ্ট আলেমদের জীবনে ইলমের এই বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট।

ইলম আমল, তাযকিয়া ও হিকমত

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। আল্লাহর নবীর এই বাণীর দ্বারা তিনি ইলমের উৎসে পরিণত হয়েছেন। কোরআনে মজিদে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে তার ভূমিকাকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب والحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم - (البقرة(١٢٨)

(হে রব, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসুল পাঠান যিনি তাদের উপর আপনার আয়াত পড়বেন। তাদেরকে কিতাব, হিকমত শিক্ষা দেবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।)

এই বিষয়টি কোরআনে মজিদে আরো তিন জায়গায় সামান্য কিছু শাব্দিক তারতম্যে বলা হয়েছে।

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم أياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون - (البقرة(١٥١)

(যেমনভাবে আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়েন এবং তোমাদের পরিশুদ্ধি করেন এবং কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান দান করেন যা তোমরা জানতে না।)

لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم اينه و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين - (ال عمران(

(আল্লাহপাক মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের উপর তার আয়াত পড়েন এবং পরিশুদ্ধ করেন এবং

তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর পূর্বে নিরেট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।)

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين - (الجمعة(٢)

(মহান আল্লাহ যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসেবে তাদের মাঝে পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে তার আয়াত বলবেন ও তাদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে বিতাব ও হিকমতের স্পা দেবেন। যদিও তারা এর পূর্বে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো।)

একজন বান্দার প্রতি তার নব চাইতে বড় অনুগ্রহ হলো তাকে হেদায়াত দান করা। ইলম দানের নবুয়তা পদ্ধতিতে আল্লাহর হিদায়াত প্রাপ্তি ছিলো অবশান্তাবী। এ জন্যে সর্বযুগে মুসলমানদের জন্যে এই ব্যবস্থাই ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠব্যবস্থা। আল্লাহর নবী মানুষের মধ্যে তিন পর্যায়ের কার্যক্রমের মাঝে তাদেরকে ইলম ও আমল শিখাতেন। যার লক্ষ্য ছিলো তাদের হিদায়াতপ্রাপ্তি।

প্রথমতঃ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন তুলে ধরে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি অনড় ঈমান সৃষ্টি করতেন।

দ্বিতীয়তঃ কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিতেন।

তৃতীয়তঃ তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন গড়ে তুলতেন।

আল্লাহর আয়াত বা তার নিদর্শন

এর প্রকাশ্য অর্থ হলো কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা। এখানে একথাটি মনে রাখতে হবে যে 'তিলাওয়াত' শব্দটি শুধুমাত্র কোরআনের জন্যেই নির্দিষ্ট, অন্য কোন বই বা গ্রন্থ পড়ার জন্য কখনও তিলাওয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। যাদের মাঝে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো তারা যে অর্থে আমরা 'পড়া' কথাটি ব্যবহার করি, তার অর্থ ভাল করেই জানতেন। তাদের উদ্দেশ্যে পড়ার কাজকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

কোরআন যেভাবে এই নবুয়তি মিশনের কাজটিকে চার বার ঘোষণা করেছে, এর থেকে আয়াতে বর্ণিত তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

প্রথমতঃ কোরআনের শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই এর তিলাওয়াত। শব্দ শুদ্ধ না হলে অর্থও শুদ্ধ হয় না। এই কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। তিলাওয়াতের কাজটি তখনই হবে যখন প্রতিধ্বনিত শব্দের দ্বারা কোরআনের অর্থ প্রকাশ করবে। এ জন্যে কোরআনকে শুদ্ধ করে পড়া ও এর অর্থ বুঝবার চেষ্টা করা অপরিহার্য। পাঠককে এই পর্যায়ে উন্নিত করার লক্ষ্যেই অর্থ না বুঝে পড়াতেও সোয়াব পাওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে উৎসাহিত করার জন্যে।

দ্বিতীয়তঃ নবুয়তী শিক্ষাদানের মধ্যে তিলাওয়াতের যে দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো, আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনগুলো কোরআনের সাবলিল ভাষায় তুলে ধরে মানুষকে তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের প্রতি যুক্তির পথে ডাক দেয়া হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানুষকে মহাসত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান দানই হলো তিলাওয়াতের তাৎপর্য। এই সব নিদর্শনের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি রহস্যের নিদর্শন থেকে শুরু করে অপরাপর বিশাল সৃষ্টি জগতের নিদর্শনাবলী তথা নবী জীবনের নিদর্শনাবলী সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সমস্ত আয়াত সমূহের উপস্থাপনে তিলাওয়াতকারীর মনে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাস চাক্ষুস দেখে বিশ্বাস করার মতই সুদৃঢ় হয়ে যায়। ঈমানের এই দৃঢ়তা ছাড়া ইসলামের সত্যিকার ইলম অর্জিত হ'তে পারে না। এই সব নিদর্শনের মাধ্যমেই তাওহিদের ধারণা পরিপক্কতা লাভ করে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয় না। মানুষ একমাত্র তাঁকেই খালেক, মালেক, রিজিকদাতা, হায়াত ও মৃত্যুর মালিক, সম্মান ও সম্ভ্রমের উৎস, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মানুষের আবেদন নিবেদন শ্রবণকারী ও কবুলকারী, অসহায়ের সহায় ও নিতান্ত আপন ও নিকটবর্তী স্বত্বা বলে স্বীকার করে নেয়। আর কোন শক্তিকে তার অংশিদার হিসেবে মানতে অস্বীকার করে। তাওহীদের এই শিক্ষাই ইসলামী উম্মাহর মল সম্পদ।

কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা

আল-কোরআন যে দ্বীন পেশ করেছে, আল্লাহর নবী তার শিক্ষা দিতেন। মানুষের জীবনের সকল জিজ্ঞাসা, চাওয়া-পাওয়া ও সকল সমস্যার সমাধানে কোরআন সাবলীলভাবে জবাব দিয়েছে। আল্লাহর নবীই এই কোরআনের আসল মর্মের জ্ঞান রাখতেন, আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে মানব সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। এটাই ছিলো তাঁর নবুয়তি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ

অধ্যায়। সাহাবায়ে কেরামদের অবিচল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা তাদের আরবী ভাষার পান্ডিত্য থাকা সত্বেও রাসুলের কাছ থেকেই কোরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে নিতেন। কোরআনে মজিদ যে আল্লাহর সব চেয়ে বড় মোজেজা- তা এর সঠিক ইলম ছাড়া বোধগম্য হবার কথা নয়। কোরআনের ইলম ছাড়া আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহ-প্রেম সৃষ্টি হ'তে পারে না। কোরআনের ভাষায় যা বলা হয়েছে এভাবে।

انما يخشى الله من عباده العلماء - (فاطر(٢٨)

(আল্লাহর কোরআনকে যারা জানে, তারাই আল্লাহকে ভয় করে।)

আল-কোরআন শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে হিকমতের শিক্ষা দেয়াও নবুয়তী কাজের অংশ ছিলো। হিকমতের অর্থ হ'লো অন্তর্নিহিত মর্ম-তত্বের তথ্যগত বিশ্লেষণ, বাস্তবতার আলোকে এর প্রয়োগ পদ্ধতি। দ্বীন বা আল-কোরআনের বাস্তব প্রতিফলনকেই হিকমত বলা হয়েছে। এ জন্যেই অনেক মুফাসসির হিকমতের অর্থ রাসুলের সুন্নাহ বা হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা হাদিসের মাধ্যমেই দ্বীন ও শরীয়তকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ হাদিসই হলো কোরআনের প্রয়োগ পদ্ধতি। এ জন্যেই আল-কোরআনকে প্রকাশ্য ও হাদিসকে গোপন কোরআন বলা হয়েছে। কোরআন ও হিকমতের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নবী মোস্তফা (সাঃ) মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের মূল সুত্র উপহার দিয়ে গেছেন।

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি

আল্লাহর নবী উপরিল্লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে ইলম দানের পর তাযকিয়ার কাজ করতেন। 'তাযকিয়া' শব্দের মূল অর্থ হ'লো, পবিত্র করা, পরিচ্ছন্ন করা। যার মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইটা দিকও রয়েছে।

প্রথমতঃ অবাঞ্ছিত উপাদান সমূহ থেকে পবিত্র করা।

দ্বিতীয়তঃ পরিচ্ছন্ন হবার পর বাঞ্ছিত উপাদানে বিকশিত করা বা উন্নতমানে পৌঁছানোর গতি সৃষ্টি। আল-কোরআনের এই তাযকিয়ার অর্থও এই উভয় দিক সম্বলিত। একাধারে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি বা পবিত্রতা। ইসলামী

চরিত্রের পরিপন্থি সকল প্রকার চিন্তাধারা, মানসিকতা, আচার, লৌকিকতা ও বদ্ধমূল সংস্কার থেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হবার পরই মূল কাজ শুরু করতে হ'বে। আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) তুলে ধরে মন-মগজ তৈরী করার কাজ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইসলামী ইলমের ভিত্তিতে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে বিন্যাসিত করতে হয়। এক কথায় ইলমের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর কাজকে তাযকিয়ার কাজ বলা যেতে পারে। মানুষ গড়ার এই কাজ কোন আংশিক কাজ নয়। মানব জীবনের কোন দিকই এই বিন্যাস কর্মের বাইরে নয় এবং এই কাজটি বস্তুতঃ প্রথম দুই পর্যায়ের কাজের চাইতে বেশী কষ্টসাধ্য। আল্লাহ ছাড়া অপরাপর সকল জড়বাদী ও আত্মিক উৎসকে অস্বীকার করা থেকে এই তাযকিয়ার কাজ শুরু হয় এবং সর্বশাল্লাহকেই সকল শক্তির উৎস হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করার সার্বিক বহি. ঘটানোর কাজ করার মাঝ দিয়ে এর পূর্ণতা লাভ হয়। এই চরম ও পরম কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছার পথে মানুষে **মানুষে**

বিভেদের আবকাশ ও আল্লাহর হিকমত

ইসলামের সঠিক পথ নির্ধারণে বিভেদের অবকাশ রয়েছে নিঃসন্দেহে। যদি আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত মানব সমাজকে ইসলামী জীবন যাপনে বাধ্য করতে পারতেন, সে অবস্থায় পৃথিবীতে কেবল আল্লাহরই বন্দেগী থাকতো যেমন, প্রকৃতির অপরাপর সৃষ্টিকূল স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই আল্লাহর আইন মেনে চলে।

কোরআনে যেমন এরশাদ হয়েছে:-

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآله الخلق والامر تبارك الله رب العلمين-

(اعراف) (চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজী আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশও অবশ্য পালনীয়, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভূরই সব অনুগ্রহ।)

و له من فى السموات والأرض كل له قانتون - (البقرة(

(আসমান ও যমিনের সব কিছুর মালিকানা তারই, সবকিছুই তার কাছে অবনত।)

و لو شاء الله لهذا كم أجمعين - (النحل (৭) (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দিতেন) অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহর এই সৃষ্টি স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক

তার নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই। হযরত আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহর ফিরিস্তারাও এই কথাই বলেছিলেন, কিন্তু বনী-আদম সম্পর্কে ফিরিস্তাদের ধারণা খন্ডন করে আল্লাহ বলেছিলেন, আমি যা চাই, তোমরা তা জানো না। আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষকেই হক ও বাতিলের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে, তাদেরকেই জীবন পথ নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ এ'ভাবে মানুষের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান;

انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا - (الدهر)

(আমি তাদের পথ নির্দেশ করেছি, অতঃপর (তাদের স্বাধীনতা রয়েছে) তারা হিদায়াতের পথ গ্রহন করবে বা কুফুরির পথ বেছে নেবে)

তাদের এই স্বাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের উপরই তাদেব বিচার করা হবে। কাজের স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের বিচার করা আল্লাহর নিকট ইনসাফের পরিপন্থি।

و على الله قصد السبيل ومنها جائر - (النحل(৯)

আল্লাহ সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন, (পক্ষান্তরে) আবার অনেক বক্র পথও রয়েছে)

(এই সোজা পথ প্রাপ্তি মানুষের সুকৃতি ও আল্লাহর অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির জন্যে কোরআনে মজিদে দোয়া ও শিখিয়েছেন সুরা ফাতিহায়।

إهدنا الصراط المستقيم - (الفاتحة)

(হে আল্লাহ, আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করুন)
সুরা হুদের নিচের আয়াতে বিষয় বস্তুকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছে;

و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لا يزالون مختلفين - الا من رحم ربك لذلك خلقهم

(هود)

(যদি তোমাদের রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানব সন্তানকে এক অখন্ডিত উম্মাহয় পরিণত করতেন। (কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়, তাই) তোমরা বিভেদে লিপ্ত থাকবে। (অর্থাৎ তোমাদের স্বাধীন চিন্তার ফয়সালা এই বিভেদের কারণ হবে। এই বিভেদের বিষফল থেকে বেঁচে থাকবে তারাই) যারা তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় আল্লাহর অনুগ্রহের যোগ্য হবে। (অতঃপর মানব গোষ্ঠীকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে বিভেদের অবকাশ রেখেই) তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামে বিভেদের অবকাশ রয়েছে। এই অবকাশ কোন বৈধতার সনদ নয়, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের ঈমানী শক্তির পরীক্ষা করেন। আল্লাহর কাছে মানুষের ঐক্যই কাম্য। অবাঞ্ছিত বিভেদে না গিয়ে ঐক্যের পথে সমবেত হতে আদম সন্তানদের প্রতি কোরআনে মজিদ ও নবী মোস্তফা (সঃ) উদ্দত আহবান জানিয়েছেন এবং বিভেদের পথ থেকে সরে থাকার জন্য সর্তক করে দিয়েছেন বার বার। পার্থক্য ও প্রকারভেদ অনস্বীকার্য। এই প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে তাযকিয়ার পরিমাপ করা যায়। বস্তুতঃ এই পরিমাপের মানদন্ডও একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত। তাই তারই প্রতি পূর্ণাংগভাবে আত্ম-সমর্পন দ্বারাই তাযকিয়ার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এর এক পর্যায়কে হাদিসে জিব্রিলে ইহসান বলা হয়েছে। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে;

أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك-

(তুমি তার বন্দেগী এমন মনোভাব নিয়ে করবে যেন তুমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো, যদি তা না হয় তবে এই বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন।)

চূড়ান্ত পর্যায়ের তাযকিয়ার পর মানুষ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও তার ক্ষমতা চাক্ষুস দেখার মতই অনুধাবন করে, সে ব্যক্তি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। তার সমস্ত অস্তিত্ব আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তাদের সম্পর্কেই হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول من عاد لى وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدي بشي أحب الى مما افترضه عليه و لايزال عبدي فيتقرب الى بالنوافل حتى أحبه - فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذى يبطش به و رجله الذى يمشى بها و لئن سألني لاعطينه و

لئن استعاذني لأعذينه.

(আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার অলীকে শত্রু মনে করে, তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ আমার নৈকট্য লাভের জন্য আমার ফরজকে আদায় করতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি নফল এবাদতের মধ্যে বরাবর আমার নৈকট্য
লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকে, শেষে আমি তকে ভালবেসে ফেলি। আর যখন তাকে ভালবেসে ফেলি আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখতে পায়, তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে কোন জিনিষ ধারণ করে, তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলাফেরা করে। সেই বান্দাহ যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা প্রদান করি, আর যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই।)

অর্থাৎ তার সমগ্র অস্তিত্ব-চেতনা আল্লাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তার সব কাজই আল্লাহর কাঙ্খিত পথে হতে থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর হেদায়াতের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে,

اشترى من المومنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة - (التوبه) ان الله

(আল্লাহপাক মুমিনদের জান-মাল আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন)

উপরের হাদীসে উন্নত মানের মুমিনকে অলী নামে অভিহিত করেছেন, কোরআনে মজিদে সমস্ত মুমীনদের অলী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোরআনে এরসাদ হয়েছে,

)الله ولى المومنين( )আল্লাহ মুমিনদের অলী) অন্যত্র বলা হয়েছে,

)الله ولى الذين أمنوا( )আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের অলী যারা ইমান এনেছে) এই পর্যায়ে ও ইমানের বিভিন্ন পর্যায় ও মানের পার্থক্য প্রনিধানযোগ্য।

তাযকিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়

তাযকিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়মেনের লক্ষ্য বা মঞ্জিলে মাকসুদ। এই পর্যায়ের তাযকিয়া ইলমের পূর্ণাঙ্গ ৭.নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ঐ মানের মুমিনগণ তাদের ইলমের কোন একটা অংশকে ও আমলের বাইরে রাখেন না। প্রতিকূল পরিবেশ, বৈষয়িক স্বার্থ, পার্থিব লিপ্সা বা মোহ কোন কিছুই তাকে হকের পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনা। এই পরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাকে যতো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বা নির্যাতন বরদাশত করতে হয়। তা সে হাসিমুখে বরণ করে নেন এবং আত্নিকভাবে পরম প্রশান্তি লাভ করেন। তার মন পরিতৃপ্ত থাকে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন ও পার্থিব শক্তির উৎসগুলোর কেউ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। এদেরকেই কোরআনে মজিদে)حزب الله(

)আল্লাহর দল) বা)صالحين( )সৎলোকদের দল) বলে চিত্রিত করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন,

(الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون (٦١) يونس) নিশ্চয়ই আমার অলীদেরকে ভীতি পেয়ে বসতে পারে না বা তারা অনুশোচনায়ও পড়বে না, বস্তুতঃ তারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়েছে।)

অর্থাৎ কোন পার্থিব শক্তির ভয়ে হকের পথ থেকে বিরত হয় না, বা পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি বা জুলুম নির্যাতনে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে না।

সাহাবায়ে কেরামগণ তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির এই চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। সাহাবা পরিবর্তীকালে প্রতি যুগে যুগে এমনি মানের মুমিনদের অস্তিত্ব রয়েছে ও আগামীতেও থাকবে। তাদের আপোষহীন চরিত্রই মুসলিম উম্মাহর পথ প্রদর্শক। রাসুলেপাকের তাযকিয়ার পদ্ধতিই একমাত্র নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, এই পদ্ধতিই মুমিনদের জীবনে কাংখিত চরম ও পরম আত্মিক বিকাশ সৃষ্টি করতে পারে।

তাযকিয়ার চূড়ান্ত রূপকে কোরআনে মজিদে)شرح صدر(বা বক্ষ উম্মোচন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরসাদ হয়েছে,

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

كانما يصعد في السماء - (الانعام(

(আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে গুমরাহীতে নিক্ষেপ করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন একেবারেই সংকীর্ণ, যেন স্ব-জোরে আকাশের দিকে চড়তে থাকে)

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه - (الزمر(

(অতঃপর আল্লাহ যার বক্ষখুলে দেন ইসলামের জন্য সে তার রবের তরফ থেকে নূরে নূরান্বিত হয়)

তাযকিয়ার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করলে আল্লাহপাক তার বান্দাহর বক্ষ খুলে দেন, তখন সে সুস্পষ্ট ভাবে হিদায়াত, গোমরাহী, হক, না হক, ভাল মন্দ দেখতে পায়। কোন ছদ্মাবরনেও গোমরাহী তার কাছ ঘেষতে সক্ষম হয়না। এই)شرح صدر - বক্ষ উম্মোচন) আল্লাহর বিশেষ দান, যা শুধু চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। হিদায়াতপ্রাপ্তির জন্যে আল্লাহর এই দানের চাইতে বড় আর কিছু নেই।

এই বক্ষ উম্মোচনের পরিমাণ ও পর্যায় ভিন্নতর ও বিভিন্ন পর্যায়ের। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ঈমানের ভিত্তিতে তাযকিয়ার আমল যতো গভীর ও ব্যাপকতর হবে তার বক্ষ উম্মোচনের স্তরও উন্নততর হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আম্বিয়ায়ে কেরামদের বক্ষ উম্মোচন, আমাদের নবীর বক্ষ উম্মোচন, সাহাবায়ে কেরামদের বক্ষ উম্মোচন, খোলাফায়ে রাশেদীনদের বক্ষ উম্মোচন, তাবেয়ীদের বক্ষ উম্মোচন, ইমাম ও মোজতাহিদদের বক্ষ উম্মোচন তথা সাধারন মুমিনদের বক্ষ উম্মোচনের পরিমাণ এক পর্যায়ের নয়। আল্লাহপাক প্রত্যেক মুমিনের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও তার দায়িত্বের অনুপাতে তাকে এই মহারত্ন দান করেন। এর ফলে তার মন-মগজ ও চিন্তাধারা থেকে সকল প্রকার সন্দেহ সংকোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ দূরীভূত হয়ে যায় এবং

সন্তুষ্টি লাভই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায়। কোন রকম কুটিল চিন্তা, দার্শনিক ধুম্রজাল, শয়তানী ওসওসা তার অটল ঈমানের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে গড়ে উঠা তাযকিয়ার এই উন্নত পর্যায়ে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ঠভাবে এই বক্ষ উম্মোচনের অস্বিত্ব বুঝতে পারে। বক্ষ উম্মোচনের এই নূরের অংশীদারত্ব ছাড়া যে ইলম তা যে কোন ও মুহুর্তে বিপদ টেনে আনতে পারে। আর এই ধরনের ইলই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অনভিপ্রেত বিভেদ টেনে এনেছে। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রাঃ) তার প্রসিদ্ধগ্রন্থ)زاد المعاد(-এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ ও যোগ্যতার উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা মানুষের বক্ষ উম্মোচিত হয়ে যায়, আল্লাহ তার অন্তরে একটা নূর পয়দা করেন, যা তার অন্তরকে সদা প্রশান্ত ও সজীব করে রাখে। যখন এই নূর বিদায় নিয়ে যায়, তার অন্তর অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বন্দীদশা অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে।

আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

اذا دخل النور القلب انفسح و أنشرح قالوا و ما علامة ذلك يارسول الله قال الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله-

(যখন এই নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়, সাহাবারা আরজ করলেন, এর নিদর্শন কি? তিনি জবাবে বললেন, এই নূরের ফলে চীরস্থায়ী জীবনের প্রতি তার সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে অস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে যত্নবান হয়ে পড়ে।)

যে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে এই নূরের অধিকারী হবে তার কবরেও এর প্রতিফলন ঘটবে। এখানে যদি তার অন্তর প্রশস্ত ও প্রাণবন্ত হয় তবে তার কবরও অনুরূপ হবে।

এমনি অন্তরের ধারক আলেমদের ইলমকে উপকারী ইলম বলা হয়েছে। তার ইলম থেকে মানব সমাজ উপকৃত হ'বে। হাফেজ ইবনে কাইয়েমের মতে এই ইলম বা এই নিয়ামতের উপস্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ মৌলিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটা অপরিহার্য। তিনি যে সব গুণাবলীর সমাবেশ অপরিহার্য মনে করেছেন সেগুলোর মধ্যে বিনয়, নম্রতা, বদান্যতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, পার্থিব বিষয় সম্পদের প্রতি অনিহা, ধৈর্য্য, ভালবাসা ও সুন্নতের অনুসরণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। সাথে যে সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত

হবার অপরিহার্য্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, পর-চর্চা, অহংকার, বড়াই ও দম্ভ, পৃথিবীর প্রতি লালসাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাথে যে সব দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হবার অপরিহার্য্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, পর-চর্চা, অহংকার, বড়াই ও দম্ভ, পৃথিবীর প্রতি লালসাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমনি উপরোক্ত গুণাবলীর অনুপস্থিতিতে মানুষের বক্ষ উম্মোচিত হয় না, তেমনি উল্লেখিত দোষ-ক্রটিগুলোর উপস্থিতিতেও এই নিয়ামত দূরে সরে যায়। যখন এই সম্পদ অর্জিত হয়, তখন পার্থিব দৈন্যতা ও বিপদ-আপদ তার আত্মিক প্রশান্তির পথে একটুও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই আত্মিক প্রশান্তিকে জান্নাত সম-আনন্দদায়ক অনুভূতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে জ্ঞানের সাথে এই নিয়ামত নেই, সেই জ্ঞানকে হিদায়াতের উৎস বলা যায় না, বরং তা যে কোন সময় ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্বে বলতে হয় যে ইসলামী জ্ঞানে পরিমাণগত যোগ্যতার চাইতে গুণগত যোগ্যতার গুরুত্ব অধিক। গুণগত মানে উত্তীর্ণ না হ'লে পরিমাণের দিক দিয়ে যত বেশী হোক না কেন, তাকে সত্যিকার ইসলামী ইলম বলা যায়না, পক্ষান্তরে পরিমাণমত যোগ্যতার দিকটাও অবহেলা করা যায় না। পরিমাণগত যোগ্যতা না থাকলে তার মানগত যোগ্যতা সে ব্যক্তির জন্যে হেদায়াতের উৎস তাত পাবে সত্যি কিন্তু মসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ বহন করতে পাবে না।

(২) মানুষের জ্ঞান যে সব বিষয়ের সমাধান করতে অপারগ, সেই সব বিষয়কে গবেষণার বা চিন্তার বিষয় বস্তুতে পরিণত করা

না দেখে ঈমান আনাই হলো ইসলামের বুনিয়াদ। মানুষের ইন্দ্রীয় বা অংগ-প্রতংগ অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডি বা আওতার মধ্যে ক্রিয়াশীল, এই গন্ডির বাইরে এ সবের কোন ক্ষমতাই নেই। এই বস্তুবাদী জগতে মানুষকে তার প্রয়োজনের মাপকাঠিতেই আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এই জড় জগতের সীমা লংঘন করতে পারে না। এই জড় জগতের প্রতিটি জিনিষই একটা জড় আইনের বা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে। আল্লাহপাক এই জড় জগতের সব কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রনে দিয়েছেন। হযরত আদমকে সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহপাক এই জড় জগতের সীমানা নির্ধারন করে দিয়েছেন। এই বিশ্বে বিচরনের জন্য, এখানের সব কিছু ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজনীয় সার্বিক যোগ্যতা প্রদান করেই আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন। কিন্তু জড় জগতই সবকিছু নয়। এই জড়জগত আল্লাহর

এই বিশাল সৃষ্টির একটা ছোট অংশ মাত্র। অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জড় জগতের জড় পর্দার অন্তরালে যে বিশাল সাম্রাজ্য বা সৃষ্টিলোক সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জ্ঞান তা ব্যপ্ত করতে অক্ষম। এই মহাসৃষ্টির ব্যাপকতা ও মানুষ বুঝতে ব্যর্থ। স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য কোন সৃষ্টির পক্ষে ব্যপ্ত করা আদৌ সম্ভব কি? আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে সৃষ্টির বিশালতা সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা মহাসৃষ্টি সম্পর্কে এই অনুমানের কোন অন্ত নেই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা কোন দিনই সম্ভব হবে না, তাই মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই। এই মহাসৃষ্টি বা সৃষ্টি রহস্যের উর্দ্ধে স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি আরো সীমাবদ্ধ। মানুষ যতোই চেষ্টা করুক না কেন তার জ্ঞান সীমার বইরে কখনও যেতে পারবে না। যারা এই মহাসত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে তারা সীমাহীন হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এখানেই গায়েবী ঈমানের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই জড় জগতের জড় পর্দার অন্তরালে যে বিশাল ও সীমাহীন সৃষ্টি রয়েছে, আল্লাহপাক তার কিয়দাংশ তার নবীদেরকে দেখিয়েছেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাহর জন্য কখনও কখনও এই জড় পর্দা উন্মোচিত করেন, তখন তারা স্বচক্ষে এসব দেখতে পান। এর উদ্দেশ্য হলো তাদের মনে চাক্ষুস অবলোকনের মতোই দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা।

কোরআনে মজিদে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে এরসাদ হয়েছে,

و اذ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال أو لم تومن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي قال
فخذ أربعة من الطير فصر هن اليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا

و أعلم ان الله عزيز حكيم - (البقرة(

(যখন ইব্রাহিম বললেন, হে রব আপনি কিভাবে মৃত্যুকে জীবন দান করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না, তিনি বললেন, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি, তবে অন্তরের প্রশান্তির নিমিত্তে (জিজ্ঞাসা করছি) আল্লাহ বললেন, ৪টি পাখি ধর, তাদের টুকরো টুকরো করো এবং এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রেখে দাও। অতঃপর তাদের ডাক দাও। তারা তোমার কাছে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত হ'বে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।) অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে;

قال رب أربى انظر اليك قال لن ترانى و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا - فلما أفاق قال سبحنك تبت اليك و

انا اول المؤمنين - (اعراف(١٤٣)

(হযরত মূসা বললেন, হে রব আমি আপনাকে দেখতে চাই, আল্লাহ বললেন, তুমি আমায় দেখতে পারবে না (তোমার চক্ষু আমার দর্শন সহ্য করতে পারবে না) হাঁ তুমি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দাও (সেখানে আমার জ্যোতি অর্পন করবো) যদি পাহাড় তার জায়গায় অবস্থান করতে পারে তবে (বুঝবে) তুমি আমায় দেখতে পাবে। অতঃপর যখন পাহাড়ের উপর তার রব তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন পাহাড় ভস্মীভূত হয়ে গেলো এবং মূসা বেহুস হয়ে গেলেন, যখন হুস ফিরে পেলেন, বললেন, আপনি এর উর্দ্ধে যে আপনার দর্শন পওয়া যায়। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পন করছি, বস্তুতঃ আমি পূর্বেই আত্মসমর্পন করেছি।) অনত্র এরসাদ হয়েছে,

وكذلك ترى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين - (الانعام ٧٥) (এবং এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান-যমিনের (গোপন) সাম্রাজ্য দেখিয়েছি যেন আমার (মহাসৃষ্টির) উপর তার বিশ্বাস জন্মে।)

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيت محكمات من أم الكتب و أخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم يقولون امناً به كل من عند ربنا و ما يذكر الا أولو الألباب - (آل

(عمران)

(তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে (দুই ধরনের আয়াত রয়েছে( )عكمات( )সুদৃঢ় বা সুস্পষ্ট) আয়াত রয়েছে, যেগুলো হলো কোরআনের মূল (আর দ্বিতীয় ধরনের আয়াত হলো( )متشاهات প্রচ্ছন্ন বা রূপক, যার মধ্যে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা রূপক আয়াত সমুহের পেছনে পড়ে থাকে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এ সব আয়াতের অর্থ বের করার চেষ্টা করে, কিন্তু এর সত্যিকার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। (এ জন্যে) যারা সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী তারা বলে, আমরা এগুলোর উপর বিশ্বাস করি। এ সব আমাদের রবের তরফ থেকেই এসেছে এবং ব্যুতপন্ন সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।)

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতে দুই ধরনের আয়াত প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনে মজিদে এই দু' ধরনের আয়াত ছাড়াও আরো বিভিন্ন শ্রেণীর আয়াত রয়েছে যেমন আগের উম্মতদের ইতিহাস বা কাহিনী)قصص(, উপমা ও উদাহরণের আয়াতসমূহ (১৩) ও সুক্ষ ইংগীত সম্বলিত আয়াতসমূহ)كتاب(এই তিন ধরনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর মতো সুস্পষ্ট অর্থ বাহক ও নয় আবার রূপক আয়াতগুলোর মতো অস্পষ্ট ও মানুষের জ্ঞান বহির্ভূতও নয়। এগুলোকে মানুষের জন্য চিন্তা ও গবেষনার বিষয় বস্তুতে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়নি।

সুদৃঢ় বা সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে মূল বা মুখ্য বলে পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে কোরআনে উপস্থাপিত সকল বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো এসব আয়াতগুলো। এগুলোকে ভিত্তি করেই কোরআনের আর সকল ধরনের আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে। যদি কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তবে তার ফয়সালাও ঐগুলোর আলোকেই করতে হবে। অর্থাৎ আকিদা বিশ্বাস ও আমলের জন্যে এই আয়াতগুলোই আসল। এগুলো থেকেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুরায়ে ফাতিহাকে মুখ্য বা মূল কোরআন বলা হয়েছে ঐ একই অর্থে। এই সুরায় কোরআনের মূল কথাগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্যে সুরা ফতিহা ছাড়া কোন নামাজই হয় না। বস্তুত দ্বীনের বুনিয়াদ হলো এই মুখ্য আয়াতগুলো। রূপক আয়াতগুলোতে মানুষের বোধগম্য হবার মতো একটা সুস্পষ্ট ধারণা মিলে। একজন মুমিনের জন্য এটাই যথেষ্ট। এর বেশী তথ্যানুসন্ধানে এসব আয়াতের নিগুড় তত্ত্ব উদঘাটন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যার ফলে অসংখ্য বিভ্রান্তি ও সংশয়ের ধুম্রজাল সৃষ্টি হতে পারে, যা আস্তে আস্তে ঈমানের জন্য বিপদ ও উম্মতের বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু কোরআনের আয়াতে নয়। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আল্লাহ এই সৃষ্টিতে মানুষের জীবন-রহস্যেই হোক বা বিশ্ব-চরাচর, সৌর-জগত বা অতল-সমুদ্রের রহস্যে; সবকিছুর মধ্যেই এই দুই পর্যায় রেখেছেন। কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট ও বোধগম্য আবার কিছু কিছু জিনিষ অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা। এমন কি মানব জীবনের ঘটনাবলীর মাঝেও এই দুয়ের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। নবী জীবনের বদরের যুদ্ধ সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়, আবার ওহোদের যুদ্ধ ও হোদায়বিয়ার সন্ধি এই প্রচ্ছন্ন পর্যায়ে পড়ে। ওহোদের যুদ্ধে আপাতঃ পরাজয় কিন্তু সার্বিক দিকদিয়ে বিজয় এই পর্যায়েরই ঘটনা। হোদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ মহাবিজয় বলেছেন, কিন্তু বাহ্যতঃ তা সুস্পষ্ট নয়। সত্যপথের পথিককে পার্থিব অপ্রতিকূলতা, আর্থিক দৈন্যতা বা নির্যাতন ও নিপীড়নের মাঝেও মুমিনের মনের প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতিও এই রূপক পর্যায়ের। কিন্তু একটা কথা সুস্পষ্ট যে মানুষের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়কে

আল্লাহ অস্পষ্ট রাখেননি। যে সমস্ত বিষয়কে অস্পষ্টতার আবরণে রেখেছেন সেগুলোর সাথে মানুষের কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার পর কোরআনী ইলম মানুষের মনে ঈমানের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলে, তখন রূপক আয়াতগুলোর নিগুঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করার প্রতি তার মোটেই উৎসাহ সৃষ্টি হয় না, বরং ঐসব আয়াতগুলো তার ঈমানকে আরো মজবুত করে দেয়। কিন্তু যাদের মনে ঈমানের নূর পয়দা হয় না তারা রূপক বিষয়গুলোর তত্ত্ব জানার জন্য এমনি চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত ঈমানের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। এদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে,

بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه و لما يأتهم تأويله - (يونس ٣٩) (বরং তারা এজন্যেই অস্বীকার করেছে যে তাদের জ্ঞান তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষাবধি এসব বিষয়ের তত্ত্ব বোধগম্য হয়নি।)

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআনের ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই, যা কিছু অস্পষ্টতা তা হলো অর্থের অন্তর্নিহিত তত্বে। যার চুড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। কোরআনের ভাষায় যদি কোন অস্পষ্টতার প্রশ্ন উঠে তবে তা আরবী-ভাষার দক্ষতার অভাবে সৃষ্ট। নবীর মোজেজা সমূহকে অস্বীকার করতে গিয়ে অনারব ও আরবী-ভাষায় অদক্ষ ব্যাক্তিরা কোরআনের ভাষায় অস্পষ্টতা আবিষ্কার করেছেন। সেই সব তফসিরকে কোরআনের তফসির বা কোরআনের ইলম বলা যায় না।

কোরআন মজিদে যে সমস্ত বিষয়কে অস্পষ্টতার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে তার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বরূপ, তার অবস্থান, আরশ-কুরসী, বেহেশত, দোজখ, ফিরিস্তা, আল্লাহর আমানত, তকদীর, তদবীর ও অপরাপর মানুষের অবোধগম্য বিষয়াদির নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। এই সব বিষয়গুলোর উপর ঈমান এনে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করাই হলো সুষ্ঠুজ্ঞানের দাবী। এসব ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা কোন কল্যাণকর কাজ নয়, বরং তা মারাত্মক সংশয়ের পথ খুলে দেয়। যার পরিণতি হলো বিভ্রান্তি ও গোমরাহী। কোরআন মজিদে সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্বেও এবং শেষ নবীর কঠোর সতর্ক বাণী থাকা সত্বেও পরবর্তীযুগে তথাকথিত পন্ডিতগণ এ সব বিষয়কে তাদের গবেষনা কাজের মূল বিষয়ে পরিণত করেছেন। সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণা বাদ দিয়ে রূপক বিষয়াদি নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায়। আকিদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহর বিভেদে এই মনোভাবই সবচেয়ে বেশী দায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোরআন মজিদ বক্রচিন্তা)ع((বলে অভিহিত করেছে। কোরআনের এই শব্দের অর্থ বক্রতা বা

পতন যা সুদৃঢ়)راسخ(এর বিপরিত। বক্রচিন্তার লোকদের পতন এভাবেই হয়েছে। উম্মতে মুহম্মদীর মধ্যে বক্রচিন্তার লোকেরা এপথেই মুয়লিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। এই অবৈধ গবেষণা কর্ম ইসলামের ইতিহাসে বিভেদের বীজ বপন করেছে, এর শাখা-প্রশাখা উম্মতে মুহম্মদীর রন্দ্রে রন্ধে বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, সহজ সরল দ্বীনকে বিজাতীয় দর্শন ও আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে, ফলে সুষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত জীবন ব্যবস্থা লক্ষ আবরনে ঢাকা পড়েছে।

রূপকভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-প্রয়াস শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যেই বিভেদ সৃষ্টি করেনি, বরং আমাদের পূর্বতন উম্মতদের ক্ষেত্রেও একথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের উম্মতের লোকেরা এই অবাঞ্ছিত বিরোধ সৃষ্টি করেছে আল্লাহর নবীর তিরোধানের প্রায় ৩০০ বছর পর, পক্ষান্তরে হযরত মুসার উম্মত তাঁর জীবদ্দশাতেই এই বক্রচিন্তার শিকার হয়েছিলো। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে,

إلى رسول الله اليكم فلما زاغو ازاغ

و اذ قال موسى لقومه يا قوم لما توذونى و

الله قلوهم والله لا يهدى القوم الفاسقين - (الصف(٥)

(স্মরন করো, যখন মুসা তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম, তোমরা আমায় কেন কষ্ট দিচ্ছো, তোমরা ভাল করেই জানো যে আমি তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর যখন তারা বক্রচিন্তার আশ্রয় নিলো, আল্লাহ তাদের অন্তরে বক্রতা দিলেন। আল্লাহ অসৎ লোকদের হিদায়াত প্রদান করেন না।)

ইতিহাসের তথ্যে জানা যায় যে হযরত মুসার কওম তার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন বক্রচিন্তার আশ্রয় নেয়। দার্শনিক কুটিল চিন্তায় তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। আল্লাহর কোন শিক্ষাকেই তারা প্রকাশ্য অর্থে সরাসরি কবুল না করে অসংখ্য প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে থাকে। আল্লাহর কালাম)كلمة الله(এর ব্যাখ্যায়, গাভী যবেহ করার ঘটনায়, মান ও সালওয়ার নিয়ামতে, দ্বীনি শিক্ষাকে তাদের সনাতন পৌত্তলিক ধারণার সাথে সমন্বিত করার লক্ষ্যে, গরুর বাছুরের পূজা করার ঘটনায়, তাদের বক্র চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মূসার ইন্তেকালের সাথে সাথেই উম্মাহর পরিচিতি 'ইসলাম' কে ইহুদীবাদে রূপান্তরিত করে ফেলে এবং ইহুদীবাদকেই হকের মানদন্ডে পরিণত করে বসে। কোরআনের ভাষায় তারা দাবী করে;

البقرة) - قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا (١٣٥) (তারা বলতো, তোমরা ইহুদী বা নাসারা হয়ে যাও, তবেই সত্যের পথ পাবে, বলো, ইব্রাহিমের মিল্লাত (মূলতঃ) ইসলামই ছিলো।)

ইহুদীদের অনুকরণে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতও একই কুটিল পথের আশ্রয় নেয়। হযরত ঈসার সৃষ্টি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাইরে আল্লাহর কালাম বা তার হুকুমের (كن হয়ে যাও) মাধ্যমে হয়েছিলো। তারা জানতো যে সারা সৃষ্টিকূল আল্লাহরই নির্দেশেই বাস্তব রূপ নেয়, আল্লাহ কোন নিয়মের অধীন নন। তিনি সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তিতেই সবকিছু আঞ্জাম দেন। কিন্তু নিয়মের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তারা এই সহজ কথাটিকে কুটিল দার্শনিক তত্ত্বে জড়িয়ে ফেললো।

কোরআনে মজিদে হযরত ঈসার জন্ম সংক্রান্ত বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে-

(ال عمران) - ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)
(আল্লাহর কাছে ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির মতোই। আদমকে যেমন মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বললেন, হয়ে যাও, অতঃপর তার সৃষ্টি হয়ে গেলো।)

হযরত আদম যেমন আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি তেমনি হযরত ঈসাও তারই হুকুমে সৃষ্ট। যাকে রূহুল্লাহ বা আমরূল্লাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারা হযরত ঈসাকে আল্লাহর সন্তান বা অবতার বানিয়ে নিলো। এটা তাদের বক্রচিন্তারই ফসল।

বিভ্রান্ত চিন্তার প্রকাশ্য নিদর্শন হলো তারা অত্যন্ত জোরে সোরে দাবী করে যে তারাই একমাত্র হকপন্থী, তারা ছাড়া আর সবাই বিভ্রান্ত বা বাতিলপন্থী। ইহুদী-নাসারাদের ব্যাপারে কথাটি স্পষ্টতঃ প্রমাণিত। তারা দাবী করতো যে ইহুদী ও নাসারাই একমাত্র হকপন্থী। আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য ইহুদী বা নাসারা হওয়া পূর্ব শর্ত। উম্মতে মুহম্মদীর বাতিলপন্থী লোকদের বেলায় এই চিন্তাধারার বহিপ্রকাশ ঘটেছে একই ভঙ্গিতে।

আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত এই বক্রতার ফলে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইহুদীদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে (مغضوب عليهم অভিশপ্ত) হিসেবে, অন্যদিকে খৃষ্টানদের জন্যে বলা হয়েছে (الضالين পথভ্রষ্ট)। ইহুদীদের সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে,

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله و

ضربت عليهم المسكنه ذلك بالهم كانوا يكفرون بايات الله - (ال عمران (১১১) (তারা যেখানেই বসবাস করুক না কেন তাদের উপর চরম ধিক্কার অর্পন করা হয়েছে (তারা চির-ধিকৃত জাতি) হাঁ তারা আল্লাহ বা মানুষের আশ্রয়কে অবলম্বন করে (জাতি হিসেবে) টিকে থাকবে। আল্লাহর তরফ থেকে তারা অভিশপ্ততা ও পর মুখাপেক্ষিতার শাস্তি প্রাপ্ত। তাদের এই পরিণতি এজন্যে যে তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে। (লাঞ্ছনা, ধিক্কার ও পরমুখাপেক্ষিতার মধ্যে দিয়েই তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে)

(৩) বিভেদের তৃতীয় কারণঃ

নফসের গোলামী বা মনোবৃত্তির দাসত্ব

মানুষের নফস বা তার মনোবৃত্তি তার অস্তিত্বের সাথে মিলে মিশে আছে, যাকে বিচ্ছিন্ন করা মোটেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ একজন মানুষের জীবনের সকল দিকও বিভাগে এই মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। এই মনোবৃত্তির স্বাধীনতা দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই মানুষের স্বাধীন সত্বা। এটা আছে বলেই মানুষের সৃষ্টিগত প্রাধান্য। এরই কল্যাণে মানুষ একাধারে সৃষ্টির সেরা, আবার নিকৃষ্টতমও। এই মনোবৃত্তিই মানুষের মনে কর্মস্পৃহা জাগায়, তাকে কর্ম চঞ্চল করে তুলে। প্রত্যেকটি মানুষের মন স্বাতন্ত্রের অধিকারী। এই মনোবৃত্তির সত্যিকার রূপ আজও মানুষের নাগালের বাইরে।

মনই একটা ধারনার জন্ম দেয়, এই ধারনাই তার বুদ্ধিতে রূপ নেয়। বাইরের কোন তথ্য তার মনে একটা প্রভাব সৃষ্টি করে, সেই তথ্যভিত্তিক ধারণা পরবর্তী পর্যায়ে তার জ্ঞানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনের কোন ধারণা বা তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বাইরের প্রভাবমুক্ত নয়। মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীন চিন্তার কথাটি অর্থহীন। মানুষের ধারণা, চিন্তা ও জ্ঞান বা বুদ্ধি অসংখ্য তথ্য ও প্রভাবের নিয়ন্ত্রনাধীন। যে মানের তথ্য তার জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে তার জ্ঞান বা বুদ্ধি ও সেই মানেরই হবে। তাই মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি বা চিন্তা সত্যিকার অর্থে কখনও স্বাধীন হ'তে পারে না। মুক্তবুদ্ধির যারা দাবী করেন, তাদের জ্ঞান ও

বুদ্ধিও সুনির্দিষ্ট প্রভাব ও ধারনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন যা স্বাধীন চিন্তার নামে তাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে জ্ঞান গড়ে উঠে তাকেই সত্যিকার জ্ঞান বা ইলম বলা হয়। এ বিশ্বাস ছাড়া তথাকথিত জ্ঞানকে ইসলাম নিছক ধারণা বা অনুমান বলে মনে করে। কেননা ঐ সব জ্ঞানে কোন চূড়ান্ত সত্য নেই। এ ধরনের জ্ঞান আজ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি পেলেও কাল সেই ব্যক্তির কাছেই তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। একজনের জ্ঞান অন্যের কাছে জ্ঞান বলে স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। কোন দার্শনিকের দর্শন, কোন চিন্তাবিদের চিন্তা, কোন বিজ্ঞানীর ফরমুলা, কোন তাত্বিকের তত্ত্বই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। বিশেষতঃ বস্তুগত জীবনের গন্ডি বহির্ভূত কোন বিষয়ের জ্ঞানকে একটা অনুমান ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

কোরআনের ভাষায় একে বলা হয়েছে নিছক অনুমান, ধারণা বা)ظن(মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই তার মনোবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। মনোবৃত্তি মানুষকে যে পথে উদ্বুদ্ধ করে মানুষ সে পথেই ধাবিত হয়।

পৃথিবীর সকল ফিতনা-ফাসাদ ও নৈতিক অধঃপতনের পেছনে মনোবৃত্তির দাসত্বের ভূমিকাই মুখ্য। এ কারণেই অনেক ধর্মে ও তত্বে মনের বিরূদ্ধে সংগ্রামকেই বৃহত্তর সংগ্রাম বলা হয়েছে। আবার মনোবৃত্তিকে দমন করতে গিয়ে মানুষের দৈহিক প্রয়োজন সহ মানুষের সামাজিক জীবনের সকল অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটাও এক ধরনের মনোবৃত্তিরই দাসত্ব।

মনের সার্বভৌমত্বের ধারনা যেমন নৈরাজ্যের হাতিয়ার, তেমনি মনোবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করার সন্যাসবাদী ধারণা মানব সৃষ্ঠির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। এই দুই চরম পন্থি ধারণার মাঝামাঝি ধারণা হলো ইসলাম। ইসলাম মনের শক্তিকে অস্বীকার করে না, বরং মনকে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ ভাবে ইসলামী তাযকিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মনোবৃত্তি থেকে বিবেকের জন্ম নেয়, যা প্রতিনিয়ত মানুষকে হকের পথে উৎসাহিত করে ও অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, মনের অন্যায় বৃত্তির ভর্ৎসনা করে। একেই ইসলামে)نفس لوامة(বা ভর্ৎসনা কারী মন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মানুষের মনে যখন ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটে, নূর সৃষ্টি হয় বা বক্ষ উন্মেচিত হয়, তখন সে মনে এক পরম প্রশান্তি নেমে আসে। মনোবৃত্তি তার দাসে পরিণত হয়ে যায়। তার আত্মার শক্তির কাছে

মনোবৃত্তি আত্মসমর্পন করে। এই পর্যায়ের মনকে কোরআনে মজিদে)مطمةবলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার এটাইচূড়ান্ত পর্যায়।

অনিয়ন্ত্রিত মনোবৃত্তির দাসত্বই দ্বীন কবুল করে নিতে বাধা দেয়। ইহুদী ও খৃষ্ঠানদের অধঃপতনের মূলে ও মনোবৃত্তির দাসত্বই বেশী দায়ী ছিলো। ইসলামী উম্মাহর গোমরাহী ও বিভেদের পশ্চাতে ও এটাই ক্রিয়াশীল। মানুষের জ্ঞান তার ধারনা বা অনুমানেরই পরিপক্করূপ। এই জ্ঞানই ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার অভ্যাস এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে একটা Custom বা Tradition গড়ে তুলে। অনুমান-জ্ঞান ও অভ্যাসের ত্রিবিধ উপাদান মানুষকে হকের পথে উত্তরনে বাধা দেয়। কোরআনে মজিদে এর বিরুদ্ধে কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

أ فريت من اتخذ الله هواه وأضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره

الية) غشاوة فمن يهديه من بعد الله الفلاتذكرون

(চিন্তা করে দেখো, যে ব্যক্তি তার। কে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তার জ্ঞান থাকা সত্বেও তাকে হকের পথ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। (মনোবৃত্তির গোলামীর ফল হিসেবে) এবং তার শরন শক্তি ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিলেন তারহিসেবে) এবং তার শ্রবন শক্তি ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিলেন, তার দৃষ্টিশক্তিতে পর্দা লাগিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারেন? তোমরা কি চিন্তা করে দেখবে না?)

এ প্রসঙ্গে আরোও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি, এরসাদ হয়েছে;

يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل

الله - (ص)

(হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, তাই হকের পথে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে। মনোবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।)

و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى - (النجم(

(তিনি নিজের মন থেকে কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন সবই আল্লাহর ওহীর ভিত্তিতে বলেন।)

(ثم جعلنك على شريعة من الأمر فا تبعها و لا تتبع أهوا الذين لا يعلمون - (الجالية (অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের পথে রেখেছি, তাই দ্বীনের পথই অনুসরণ করো এবং ঐ সমস্ত লোকদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করোনা যারা জানে না।)

لو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض - (المومنون(٧١)

(যদি সত্য তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করে তবে সারা বিশ্বজগত ও সৌর-জগতে বিশৃংখলা দেখা দিতো।)

اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواتهم - (النحل (١٠٨) (তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, ফলে তারা তাদের মনের দাসত্ব করেছে।)

أ فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهوائهم - (محمد (١٤) (ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের রবের তরফ থেকে প্রকাশ্য যুক্তির (হেদায়াত) উপর রয়েছে তারা কি এমন লোকদের সমকক্ষ হতে পারে, যাদের মন্দকাজ গুলো তাদের কাছে চাকচিক্যময় মনে হয় এবং তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করে।)

و قالوا انا وجدنا أباءنا على أمة و انا على اثارهم مقتدون - الزخرف (٢۴) (তারা বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ পথের অনুসারী হিসেবেই পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংকেরই অনুসরণ করি।)

أو لو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون - (البقرة(٧٠)

(যদি ও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞানের পথে ছিলো না এবং তারা হিদায়াতার পথে ও ছিলো না।)

قل أولو جئتكم باهدى كما وجدتم عليه أبائكم قالوا انا بما أرسلتم به كافرون-

(الزخرف (٢٤)

(আপনি বলে দিন, যদিও আমি তোমাদের কাছে এমন আদর্শ নিয়ে এসেছি যা ঐ সমস্ত পথ থেকে অনেক সরল যা তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার তরফ থেকে পেয়েছো, (তোমরা তা মানবে না) তারা জবাবে বলবে, আমরা তো ঐ আদর্শ অস্বীকার করছি, যে আদর্শ নিয়ে আপনি প্রেরিত হয়েছেন।)

ان يتبعون الا الظن و ما تهوي الانفس - (النجم (٢٣)

(তারা অনুসরণ করে একমাত্র তাদের ধারনাকে এবং ঐ সব কিছুকে যা তাদের মনোবৃত্তি চায়।)

فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم - (القصص (٥٠) (তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তবে আপনি জেনে নিন যে তাদের সাড়া না দেয়ার কারণ হ'লো তারা তাদের মনোবৃত্তিরই অনুসরণ করছে।)

واعلم ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم - (الحجرات (٧) (জেনে রেখো, তোমাদের মঝে আল্লাহর রাসুল বিদ্যমান রয়েছেন, যদি তিনি অনেক ব্যাপারে তোমাদের মতামতের অনুসরণ করেন তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।)

ان الظن لا يغنى من الحق شيئا - (الحجرات (٢٨)
(তারা জাহিলী ধারনায় আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণায় অনুমান করে।)

ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الفن - (النساء (١٥٧) (যারা তার সম্পর্কে বিভেদে লিপ্ত তারা আসলে সন্দেহে নিপতিত, তারা আসলে কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নেই, বরং ধারণার আনুগত্য করে।)

و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان

هم الا يظنون - (الجالية(٢٤)

(তারা বলতো, এটা আমাদের পৃথি ীবন, এখানে আমরা জীবিত থাকি বা মৃত্যবরণ করি, একমাত্র যুগের বিবারা মৃত্যবরণ করি। এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা অনুমান করে মাএ
আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

وانه سيخرج في امتى أقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه

عرق و لا مفصل الا دخله - ابو داود) (ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যাদের মধ্যে মনোবৃত্তির ও নফসের দাসত্ব এমন ভাবে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে, যেমন পাগল কুকুরের কামড়ের বিষক্রিয়া তার শরীরের রন্ধ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবে যে শরীরের কোন অংশ এই বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে না।)
এই বিষক্রিয়া শরীরের রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ায় আরোগ্যলাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবার কোন সুস্থ ব্যক্তিকে যদি কোন বিষক্রিয়া গ্রস্থ ব্যক্তি দংশন করে। তবে সেও ঐ পাগল কুকুরের মতোই ভয়ানক হয়ে দাড়ায়। তার অস্বিত্বই মানব সমাজের জন্য বিপদের উৎস হয়ে দাড়ায়।

এ ভাবে যখন কোন ব্যক্তি মনোবৃত্তির বা নফসের দাসে পরিনত হয়ে যায় তখন তার সমগ্র অস্বিত্বই মানবতার জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। মূলতঃ এই গোমরাহী জ্ঞানের নামে সৃষ্টি হয় তাই মূর্য্যতার ছায়ায় যে গোমরাহী সৃষ্টি হয় তার চেয়ে এটা বেশী মারাত্মক। এমনি ধরনের মানুষ যখন তার মনকেই খোদার স্থানে সমাসীন করে, তখন তার নফসের দাসত্ব তার কাছে আল্লাহর দাসত্ব বলেই প্রতীয়মান হয়। মানুষ যখন হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তখন তার সমগ্র শক্তি-চেতনা আল্লাহর সন্তোষের জন্য উৎসর্গ করে। তেমনি যখন কোন ব্যক্তি নফসের দাসে পরিণত হয়ে

যায়; তার সারা প্রচেষ্টা মনোবৃত্তির সন্তোষের জন্যই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি সার্বিক ভাবে হৃদয়ংগম করার জন্য নিচের কথাগুলো মনেরাখতে হবে।

প্রথমতঃ কোরআনে মজিদে বা হাদিসে যেখানেই মনোবৃত্তি বা নফসের আনুগত্যের কথা আলোচিত হয়েছে। সেখানেই এর কুফলের কথাই বলা হয়েছে। কোথাও এর প্রশংসা করা হয়নি। তাই মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তার ধারণা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি। মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তা মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মনোবৃত্তির দাসে পরিণত করে, যা সত্যিকার প্রত্যয় সৃষ্টিকরে

মানুষের কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা বা মুক্তবুদ্ধির ইতিহাসই একথার সত্যতা প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহপাক মনোবৃত্তির দাসত্ব ও হিদায়াতকে দুইটা পরস্পর বিরোধী উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। মনোবৃত্তির দাসত্ব ও হিদায়াত একই সাথে চলতে পারে না। মনোবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে স্বার্থপর, লোভী ও নির্লজ্জ করে তুলে যা হিদায়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। হিদায়াতের নিয়ন্তন ছাড়া মনোবৃত্তির বা নফসের শাসন মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করে। মানুষের গোলামী থেকে মানব সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়ে আল্লাহর দাসে পরিণত করার জন্যেই হিদায়াত এসেছে। আবার যখন তথাকথিত ধার্মিক লোকদের উপর মনোবৃত্তির দাসত্বের নেশা চেপে বসে, তখন তারা খোদার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর গোলামীর নামে মানুষকে তাদের গোলামে পরিণত করে বসে। এই সব লোকদের সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, তারা গোমরাহীর এমনি এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তাদের জন্যে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কেননা তারা নিশ্চিন্তভাবে ধারনা করতে থাকে যে তারা আল্লাহরই বন্দেগী করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের মনোবৃত্তিরই দাসত্ব করছে। যখন কোন ব্যক্তি
তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারার ডি) চেষ্টা করে তখন সে ইসলামের ঐসব কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার জ্ঞানগুলোকে মেনে নেয়, যেগুলো তার
মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিশীল, আবার যখন কোন জ্ঞান তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে তখন কোরআন ও হাদিসের সেই শিক্ষাকে নিজের মর্জি মতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে তার মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে, এটা হলো মনোবৃত্তির বা নফসের জঘন্যতম দাসত্ব।

হিদায়াত প্রাপ্তির জন্যে মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রন অপরিহার্য। প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রন ছাড়া হিদায়াতের পথ উন্মুক্ত হয় না। মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রনের সীমা ও ইসলাম সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

মনোবৃত্তি বা নফসের নিয়ন্ত্রন বলতে মানুষের বৃদ্ধি ও জ্ঞানকে ব্যবহার না করা বুঝায় না। বরং ইসলাম মানুষকে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও সুষ্ঠুবুদ্ধির প্রয়োগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতেই মানুষ তার কর্মক্ষেত্র ও তার সীমা নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

এই জ্ঞানের ভিত্তি হতে হবে ইসলামী আকিদার মূলনীতি গুলো, তা হলেই সে জ্ঞান সত্যিকার আত্ম পরিচিতির উৎস হ'তে পারে।

আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এই প্রতিনিধিত্বের সঠিক উপায়-উপাদান সংগ্রহ করাই হলো জ্ঞানের কাজ। মনোবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করার পরিবর্তে তাকে বিদ্রোহী করে তুলে যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর নয়।

তৃতীয়তঃ মনোবৃত্তির দাসত্ব ও অহীর জ্ঞান পরস্পর বিরোধী। মনোবৃত্তির দাসত্বকে উৎখাত করাই হলো ওহীর লক্ষ্য। মনের অনুসরণ ত্যাগ করেই নবীরা ওহীর জ্ঞানে বলীয়ান হয়েছিলেন। এই ওহীর জ্ঞানই হিদায়াতের উৎস। ওহীর জ্ঞান মানুষকে বিশ্বাসের দাবী জানায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তার জ্ঞান সুসংহত হয়, যাকে ঈমান বলা হয়। ওহী স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ওহীর জ্ঞান ঈমানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। মানুষের মনোবৃত্তি তাকে এই জ্ঞানের পথে বাধা দান করে এবং জ্ঞানের সঠিক উৎস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মনোবৃত্তির দাসত্বের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা আপাতঃ দৃষ্টিতে জ্ঞান বলে প্রতীয়মান হলেও তা তার মনোবৃত্তির ধারণা মাত্র। যা তাকে কোরআন হাদিসের অনুসরণ করতে বাধা দিয়ে ওহীর জ্ঞানের অপ-ব্যাখ্যা করতে উৎসাহ দেয়। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে,

الذين يقيسون الأمور برائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحرام-

(যারা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা মতো কিয়াস করে এবং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলে ঘোষণা করে।)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এদের থেকে দূরে সরে থাকার জন্য মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

من أحب ان يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان و مجالسة اصحاب الأهوأ فان مجالستهم

الصق من الجرب-

(যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে মর্যাদা দেয় তাকে শয়তানী সহবত ও নফসের পূজারীদের সংস্রব থেকে দূকে থাকতে হবে, কেননা তাদের বিষাক্ত চিন্তা সংক্রমিত হয়।)
শয়তানী সহবত ও আত্মপূজারীদের সংস্রবই দ্বীনের ব্যাপারে ভিন্ন মতের

পথ খুলে দেয়।

বিভেদের চতুর্থ কারণঃ

অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজের গোলামী।

নফস বা মনোবৃত্তি যেমন মানুষের সত্ত্বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে আছে, তেমনি তাদের রীতিনীতি, অভ্যাস ও রসম রেওয়াজ ও তাদের অস্তিত্বের অংশ হ'য়ে যায়। এগুলো মানুষের অভ্যন্তরে গভীর প্রভাবশালী উপাদান। মানুষের অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজ, তা ব্যাক্তিগত হোক বা সামষ্টিক, তাদের পরিচিতির বাহন হয়ে পড়ে, যাকে অস্বীকার করা বা অবহেলা করা অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার। আবার যদি এই সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজের পশ্চাতে ধর্মের প্রভাব থাকে, তবে তাদের প্রভাব আরো গভীর হয়। পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এই সব রীতিনীতি, অভ্যাস বা রসম-রেওয়াজের ব্যাপকতা ও বিশালতা এতো বেশী যে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এসব রীতিনীতির অধিকাংশ আবার ধর্মের খোলসে বিদ্যমান। সভ্যতা ও শিক্ষার বিকাশে এই সব অভ্যাস ও রীতিনীতির ব্যাপকতা ও কঠোরতা অনেকাংশে হ্রাস পেলেও এর মূল অনেক গভীরে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এসবের ক্রিয়াশীলতা কমে যায় বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এ সবের রূপ পালটে যায় মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এসব অভ্যাস ও রীতিনীতির ধারক ও বাহকরা এসব কিছুর অসারতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্বেও বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কারণে অস্বীকার করতে পারে না, বরং সযত্নে এসব কিছুর লালন করতে থাকে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন রীতিনীতি ও অভ্যাস অত্যন্ত বর্ব্বর ও অশালীন ধরণের। কিন্তু সেখানের জনগণ ঐ সবগুলোর সযত্বে লালন করে যাচ্ছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বই অভ্যাস ও রীতিনীতির উপরই টিকে রয়েছে, এমন কি সভ্যতার দাবীদার ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অসংখ্য অযৌক্তিক রীতিনীতি রয়েছে। যার প্রতি সেখানের জনগণের মমত্ববোধের অভাব নেই। মানুষ তার স্বভাবজাত দুর্বলতার রোগে আক্রান্ত। এগুলো দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এগুলো মানুষের সহজাত।

এসব রীতিনীতি তাদের স্বকীয়তার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ঐ সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজকে Custom কিংবা Culture বা Heritage বলে চিহ্নিত করা হয় এবং ঐ সমস্ত জনগোষ্ঠির জন্য মূল্যবান সম্পদ বলে উল্লেখ করে এর সংরক্ষনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়। এই অনুভূতিও মানুষের সহজাত। পক্ষান্তরে মানুষের যে সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ ধর্মভিত্তিক গড়ে উঠে, আস্তে আস্তে সেগুলোই মুখ্য ধর্মীয় কাজ বলে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ঐগুলোকে ত্যাগ করা তাদের কাছে প্রকারন্তরে ধর্মকেই ত্যাগ করা বলে মনে হয়। এই সব অভ্যাস, রীতিনীতি বা রসম-রেওয়াজই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভেদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।

মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস, রীতিনীতির উন্মেষ ঘটেছে। ইসলামের দীর্ঘ ১৪ শত বছরের ব্যবধানে বিভিন্ন ভৌগিলিক বা আঞ্চলিক প্রভাবে অনেক রীতিনীতি মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে। আবার কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান অন্যান্য জাতির রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান থেকে এসেছে। অবিভক্ত ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছিলো। বিশাল ভূখন্ডের কোটি কোটি মানুষ নিজেদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামের ঝান্ডাতলে সমবেত হয়। তাদের পূর্বতন অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার ইত্যাদি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের ইসলামী জীবনেও এসব তাদের স্বকীয়তার পরিচায়ক হ'য়ে টিকে থাকে। এ সবগুলো তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিলে মিশে আরো নতুন নতুন রসম-রেওয়াজের জন্ম দেয়। এ সবগুলো তাদের জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। তদুপরি এই উপমহাদেশে যে সমস্ত দেশের লোকেরা শাসন করেছে, বিশেষতঃ ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের অনেক রীতিনীতি, অভ্যাস ও আচার আমাদের রীতিনীতি অভ্যাস ও আচারের সাথে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। অতঃপর দীর্ঘদিনের অনুসরণ করার ফলে এগুলো আমাদের রীতিনীতি, অভ্যাস, সস্কৃতি বা Heritage এর অংগ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমাদের এমন অসংখ্য অভ্যাস, রীতি বা আচার রয়েছে যা ধর্মীয় কাজ বলে পরিগণিত বা অন্যকথায় অপরিত্যাজ্য। এসব রসম-রেওয়াজের যুপকাষ্টে ইসলামের সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব নিয়ম নীতি, অভ্যাস, আচার বা রসম-রেওয়াজ বিভেদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিভেদের পঞ্চম কারণঃ পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ টিকে থাকলে এবং ভিন্ন মত প্রকাশের নিয়ম নীতি মেনে চললে মতপার্থক্য বিরোধে বা বিভেদে পর্যবসিত হয় না। কেননা সেখানে অনাস্থা ও বিদ্বেষ দেখা দেয় না। সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও মত পার্থক্য ছিলো। তারা ভিন্ন মত প্রকাশের নিয়ম নীতি মেনে চলতেন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ভুলে যেতেন না। তাই তাদের মত পার্থক্যকে বিরোধ বা বিভেদ বলা হতো না। কিন্তু পরবর্তিকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অভাব দেখা দেয় ও সংগত মত পার্থক্য প্রকাশ করতে গিয়েও পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে থাকে, ফলে তা বিভেদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অতঃপর অবাঞ্ছিত বিরোধ দেখা দিলে তা চরম শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। একই ধরনের মত পার্থক্য যা সাহাবাদের

মাঝে সংঘটিত হয়েছে, তাকে ইতিহাসে কোন দিনই বিরোধ বা বিভেদ বলা হয়নি, বা তা কোন বিভেদই ছিলো না, কেননা তাদের মধ্যে অনাস্থা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিলো না। পক্ষান্তরে সেই একই ধরনের মত পার্থক্য পরবর্তি পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যে চরম অনাস্থা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বিভেদের পথ খুলে দিয়েছে। আসলে মত পার্থক্য বিভেদের কারণ নয়, বরং পরস্পরে অনাস্থা-বিদ্বেষের মনোভাব এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অভাবই মূলতঃ বিরোধ ও বিভেদের কারণ। পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ ইসলামী ঐক্যের পথে বিরাট বাধা ও বিষাক্ত উপাদানের কাজ করে। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলেই অনাস্থা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এজন্যে ইসলাম ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সমুন্ন রাখার উপর সদা গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনকে পর্যুদস্ত করতে যে সমস্ত মানবীয় রোগ সর্বাধিক কার্যকরী, ইসলাম সেই সমস্ত রোগকে উৎ躍াত করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। পারস্পারিক আস্থা ও সৌহার্দতা বজায় রাখার জন্যে সর্বতোভাবে যত্নবান হতে হবে।

(কাফিরদের ষড়যন্ত্র

এতে সন্দেহ নেই, মুসলিমবিদ্বেষী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বহু লোক মুসলিমদের সবকটি সারিতে বংশ, রক্ত, গোত্র, দেশ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সূক্ষ্মভাবে চুপে চুপে ঢুকে পড়ছে। তারা প্রতিটি সারিতে সঙ্গতি ও আনুকূল্য বজায় রেখে ঢুকে, যেন মুসলিমরা তাদের কথা সহজে গ্রহণ করে নেয়। তারা মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে দক্ষ হাতে কেটে দেয় এবং হৃদয়ে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারীদের কেউ কেউ অনেক সময় মুসলিমদের নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকে। কিন্তু মুসলিমদের কোনো খবরই নেই, তারা তা বুঝতেও পারে না; অথচ ওই ষড়যন্ত্রকারীরা দ্বীনি গায়রতের মুখোশধারী একেকজন কসাই।

অতএব, বুদ্ধিমান মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইসলামের সব শত্রুর দিকে লক্ষ করা- ধর্ম, মত নির্বিশেষে তারা সবাই বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তাদের নিজেদের বাহ্য কিংবা অভ্যন্তরীণ কোনো দ্বন্দ্ব ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং যেকোনো মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার পাঁয়তারাতে কোনো ফাটল সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসলামকে আঘাত করার বাহ্য উপকরণের তুলনায় তাদের গোপন উপকরণ অনেক বেশি ও শক্তিশালী। তারা সবাই-ই বাতিলের পক্ষে এক। পাপ কাজ, সীমালঙ্ঘন, মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি, দ্বন্দ্ব-অনৈক্য সৃষ্টি এবং তাদের মাঝে ফাসাদ ও মারামারির বীজবপনে

তারা একে অপরের সহযোগী। শত্রুদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা, শক্তি-সামর্থ্য, উপায়-উপকরণ অনুযায়ী আপন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের একজনকেও ব্যতিক্রম পাবেন না। আল্লাহর শপথ, ওসব শত্রুর কেউ-ই আমাদের বন্ধু, সহযোগী কিংবা আমাদের প্রতি আন্তরিক ও দয়ালু নয়।

আপনি তাদের দেখতে পাবেন, (এবং অনেক দৃশ্যে তাদের দেখেছেনও) মুসলিমদের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ। কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র অপর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে
আক্রমণ করলে ওরা বোবা সেজে বসে থাকে, কথা বলা ভুলে যায়। আপনার সামনেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশগুলোর দিকে একটুখানি তাকিয়ে দেখুন। কাফির-মুশরিকরা মুসলিম উম্মাহকে সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, চারিত্রিক, ভ্রাত্রীয় ও আর্থিকভাবে অক্ষম করে দিতে ঐক্যবদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি থামিয়ে দিতে তারা সবাই-ই একমত। তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রতিভাবান লোকদের প্রলুব্ধ করে নিতে থাকে। এতসব বিষয়ে তারা একমত হয়েছে, যেন মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, তাদের সারিতে ফাটল সৃষ্টি হয়, তাদের দেশগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। না কোনো সহিহ আকিদা, না কোনো প্রকৃত ঈমানি ভ্রাতৃত্ববোধ, না কোনো সঠিক আসমানি কিতাব তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। আর না এমন কোনো দয়ালু রাসূল তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন, যার ওপর তারা ঈমান আনে এবং সঠিকভাবে তাঁর অনুসরণ করে; বরং মুসলিম উম্মাহর প্রতি শত্রুতাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে।

অথচ আমরা মুসলিম উম্মাহ। আমাদের আকিদা এক ও সঠিক। আল্লাহপ্রদত্ত একটি বিশাল কিতাবও আমাদের রয়েছে। রয়েছে পথপ্রদর্শনকারী ও সমন্বয়কারী একটি নববি বার্তা। এত কিছু সত্ত্বেও আমাদের এমন কিছু লোক আছে যাদের কাজই হলো-উম্মাহয় ফাটল সৃষ্টি করা, ঐক্য ভেঙে ফেলা, অনৈক্যের বীজ সরবরাহ করা, জামাআতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং পরস্পরে বিবাদ ও বিরোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এসব করেও আবার তারা মনে করে, তারাই দ্বীনের সহযোগী, বিশ্বাসের হিফাযতকারী, শরিয়াহর প্রচারকারী, সালাফ সালিহের অনুসারী; অথচ বাস্তবতা হলো-এরা সবাই এসব শব্দের অর্থের বিনাশকারী এবং বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্নকারী, বিনষ্টকারী।

মতবিরোধের তীব্রতা ও এর কারণ

তিক্ত হলেও এটা সত্য যে, মুসলমানদের পরস্পরে বিভেদ ও বিদ্বেষ গোপনীয় কিছু নয়। আল্লাহ না করুন, এ বিভেদ যুদ্ধের রূপ নিলে এবং মুসলমানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে কোরআন মাজিদ আমাদের বলে, রং ও বর্ণ, দেশ ও জাতীয়তা এবং গোত্র ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করা, এদের মধ্যে হক ও সত্যের পথে কে আছে; আর কে সীমালঙ্ঘন করছে। যে পক্ষ সীমালঙ্ঘন করবে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা আবশ্যক। এবং সীমালঙ্ঘন ছেড়ে আল্লাহর হুকুম মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের সন্ধি করতে কোরআন মাজিদে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘মুসলিমদের দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ো। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করে দিয়ো। এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।’ -সুরা হুজুরাত : ৯

অভিশপ্ত শয়তান যে সব কূটকৌশল ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে পবিত্র কোরআনে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

প্রথম : মুসলমানদের মনে পরোপকারিতা, অন্যের কল্যাণকামিতা ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা দুর্বল হয়ে পড়া এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের অন্যতম কারণ। ইসলামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা হৃদয়ে না থাকলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইসলামি ঐক্যের গুরুত্ব মনে না থাকাই স্বাভাবিক। তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়াকে আর দোষের কিছু মনে হয় না।

দ্বিতীয় : মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে দেওয়ার দ্বিতীয় মৌলিক মাধ্যম হলো এক মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে কুধারণা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে এবং অমূলক ধারণাকে গোনাহ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।’ -সহিহ বোখারি : ৫১৪৩

তৃতীয় : কুধারণা থেকে গিবত ও অপবাদের মতো বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্ম নেয়। কারও প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হলে মনের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষগুলো মনের আনন্দে বর্ণনা করার একটা পঙ্কিল ধারা তখন শুরু হয়ে যায়। কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি আলোচনা করাকে গিবত বলা হয়। কোরআন মাজিদের দৃষ্টিতে গিবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর। গিবত এত সূক্ষ্ম গোনাহ যে, কোনো কোনো পরহেজগার ব্যক্তিও এ গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। তখন এটা গোনাহ হওয়ার বিষয় তাদের মনে জাগ্রত থাকে না। কারণ অন্যের দোষ বর্ণনা করার মধ্যে মন এক ধরনের মিথ্যা আনন্দ খুঁজে পায়। তাই মধু মনে করে এ বিষপান করতে থাকে।

চতুর্থ : চতুর্থ বিষয় ভুল ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা। কারও প্রতি ঘৃণা জন্মালে অনেক সময় তা শুধু গিবতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তখন অলীক সব কল্পকাহিনি বানিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সত্য-মিথ্যা কথা প্রচার করা হয়। কখনো তো মূল ব্যাপারটি একরকম থাকে তবে এর সঙ্গে নিজ থেকে বিভিন্ন কথা জড়িয়ে রঙ লাগিয়ে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেওয়া হয়। বাস্তবতা তখন পুরোপুরি বদলে যায়। অনেক কবিরা গোনাহের সমন্বয়ে এ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মিথ্যা, গিবত, অপবাদ, মুসলমানকে লাঞ্ছিত করা, মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি কবিরা গোনাহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাই কারও ব্যাপারে কোনো কিছু শুনলে যাচাই-বাছাই ছাড়া তা বিশ্বাস করা এবং সত্য মনে করে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য কোরআনে আদেশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এমন অবাস্তব সংবাদদাতাদের ফাসেক আখ্যায়িত করে তাদের অবিশ্বাসযোগ্য ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

একে অন্যের বিরুদ্ধে যখন এমন ভুল ও মিথ্যা সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে তখন পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে ওঠে। ফলে মুসলমানদের যে সময় ও শক্তি কাফেরদের মোকাবিলায় ব্যয় হওয়া উচিত ছিল তা নিজেদের কোন্দল ও রেষারেষির মধ্যেই ব্যয় হয়ে যায়। প্রত্যেকেই অন্যকে দোষী প্রমাণিত করে খাটো করে দেখানোর জন্য নিজের সমস্ত মেধা ও প্রতিভা খরচ করে। এভাবে মুসলমানদের সময় ও শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং ধন-সম্পদ নিজেদের মাথা ফাটাফাটিতে শেষ হয়ে যায়। আর ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে থাকে। কারণ, এ অবস্থায় মুসলমানরা নিজ শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে না। আফসোস! বর্তমানে পুরো মুসলিম সমাজ এ ভয়াবহ শাস্তির আগুনেই জ্বলছে।

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং লড়াই ও ঝগড়া বাধানোর জন্য শয়তানের আবিষ্কৃত কিছু কিছু উপায় এমন, যা কেউ খারাপ চোখে দেখে না। এ বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য শয়তান কখনো ধর্মের পথ বেছে নেয় এবং কিছু চিন্তা-বিভ্রান্তি লোকের মাথায় নিত্যনতুন ধারণা প্রসব করতে থাকে। কখনো রাজনীতির অঙ্গন বেছে নেয় এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কখনো আঞ্চলিক ভালোবাসা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের মূর্তি নির্মাণ করে কিছু 'সামেরিকে' তার পূজায় লাগিয়ে দেয়, যারা মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কখনো শ্রেণিগত বৈষম্য উসকে দিয়ে রক্তপাত ঘটাতে এবং সমাজ ও পরিবেশকে রণক্ষেত্রে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এসব কিছু আজ মুসলিম সমাজকে জাহান্নামের নমুনা বানিয়ে দিয়েছে। আর শয়তানের তৈরি এ জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে মুসলমানরাই ইন্ধনে পরিণত হচ্ছে।

কোরআন এর আলোকে ঐক্যের অপরিহার্যতা

ss

: মুসলিম উম্মারহ'র একতার জন্য যে সমাধানটা তা আমাদের কাছেই আছে। বক্তব্যের শুরুতেই যে আয়াতটা বলেছিলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন, (সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত- ১০৩) -এ উল্লেখ

অর্থ "তোমরা আলাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা'র রজ্জু কোনটা? আল্লাহর রজ্জু হলো মহাগ্রন্থ 'আল কুরআন "| আল্লাহ বলেছেন- তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

এখানে কেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? দ্বিগুণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের (সুূরা-নিসা, অধ্যায়-4, আয়াত- ৫৯) -এ বলা হয়েছে

অর্থঃ "আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-কে মেনে চলো।"

আল্লাহ আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন। অনেক স্থানেই তিনি এ কথাগুলো বলেছেন। সব মিলিয়ে পবিত্র কুরআনের ২০টিরও বেশি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন

: অর্থ: "আলাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-কে মেনে চলো।"

সূরা আলে ইমরানের ৩২, সূরা আলে ইমরানের ১৩২, সূরা নিসার ১৩, সূরা নিসার ৫৯, সূরা নিসার ৬৯, সূরা নিসার ৮০, সূরা তাওবার ৭১, সূরা নুরের ৪৭,

সূরা নুরের ৭২, সূরা নুরের ৫৪, সূরা আহযাবের ৩১, সূরা আহযাবের ৩৩, সূরা মুহাম্মদের ৩৩, সূরা ফাতাহ'র ১৭, সূরা হুজরাতের ১৪, সূরা মুজদালাহ'র ১৩ এবং

সূরা তাগাবুনের ১২, এরকম ২০টির বেশি স্থানে আল্লাহ বলেছেন। (সুরা-নুর, অধ্যায়-২৪, আয়াত- ৫৪) -এ উল্লেখ করা হয়েছে
[২৪:৫৪] আন নূর

قُل أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّما عَلَيهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيكُم ما حُمِّلتُم وَإِن تُطيعوهُ تَهتَدوا وَما عَلَى الرَّسولِ إِلَّا البَلاغُ المُبينُ

বায়ান ফাউন্ডেশন:
বল, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

তাহলে আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে- আল্লাহর কুরআন ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহীহ হাদীস। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বলেছেন- “তোমরা সবাই
আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধরো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।” আর এই রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন- (সুরা-আনআম, অধ্যায়-৬, আয়াত- ১৫৯) -এ উল্লেখ করা হয়েছে
[৬:১৫৯] আল আনআম

إِنَّ الَّذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعًا لَستَ مِنهُم في شَيءٍ إِنَّما أَمرُهُم إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِما كانوا يَفعَلونَ

বায়ান ফাউন্ডেশন:

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন।

তার মানে ইসলাম ধর্মে নানা মত ও পথের প্রচলন করা ও তৈরি করা নিষিদ্ধ, এটা হারাম। আর পবিত্র কুরআনে এই কথাটা অনেকবার বলা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন
বলেছেন(সুরা-রোম, অধ্যায়-৩০, আয়াত. ৩১ ও ৩২) -এ উল্লেখ করা হয়েছে

অর্থ: "মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না, যারা আলাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিক বানিয়ে উপাসনা করে। আর তাদের মতো হইও না যারা দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় আর প্রত্যেক দল উল্লাস করে যে, তারা সত্যের পথে আছে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা রোমের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে বলেছেন যে, তাদের মতো হইও না যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিককে উপাসনা করে। তাদের মতো হইও না যারা দ্বীনে মতভেদ মতভেদ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় আর প্রত্যেক দল উল্লাস করে যে, তারাই সঠিক ও সত্যের পথে আছে
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ কথাটা আবার বলেছেন(সুরা-মুমিনুন্য অধ্যায়-২৩, আয়াত-৫৩) -এ উল্লেখ করা হয়েছে
فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾
অর্থ: "তারা প্রত্যেকেই উল্লাস করে যে, আমরাই সত্যের পথে আহছি।"

এছাড়া পবিত্র কুরআনের (সুরা-আস শুরা, অধ্যায়-৪২, আয়াত- ১৩ ও ১৪) এ উল্লেখ করা হয়েছে,
অর্থ "তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো আর কোনো রকম মতভেদ সৃষ্টি করো না। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে সমভেদ দলে বিভক্ত হইও না।

তাহলে ইসলাম ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করা হারাম। এটা নিষিদ্ধ। আমি চারটা রেফারেন্স উল্লেখ করলাম; কিন্তু এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে।

তবে যদি কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কী? আপনার মাযহাব কী? তখন কেউ বলবে আমি হানাফী, কেউ বলবে আমি শাফেয়ী, কেউ বলবে আমি আহলে হাদীস।

আমাদের প্রিয় নবী কী ছিলেন? তিনি কী হানাফী ছিলেন? নাকি ছিলেন মালিকী, নাকি শাফেয়ী ছিলেন অথবা ছিলেন হাম্বলি, নাকি ছিলেন আহলে হাদীস, নাকি ছিলেন সালাফী? তিনি কী ছিলেন? আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

(সুরা- আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৭) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

অর্থঃ "ইবরাহীম (আ) ইহুদী অথবা খিস্টান ছিলেন না: তিনি ছিলেন আত্মসমপর্ণকারী মুসলিম/"

অর্থ "তোমরা জিহাদ করো আনলাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমরা জিহাদ করো অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলার সাথে। আলাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি/। তিনি তোমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন সে দ্বীন হচ্ছে ইবরাহীমের দ্বীন আর

তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম, আগের সকল কিতাবে এবং এই কিতাবেও। সুতরাং নামায আদায় করো এবং যাকাত দাও।/"

তাহলে দেখা যাচ্ছে- আল্লাহ আমাদের মুসলিম নামে ডেকেছেন, আর আমাদের জন্য এই মুসলিম নামই নির্ধারণ করেছেন আগেকার আসমানী কিতাবে এবং এই (কুরআন) কিতাবেও। এছাড়াও আপনারা কুরআনের আরো অনেক আয়াতে দেখবেন, আল্লাহ আমাদের সম্বোধন করেছেন মুসলিম বলে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন (সূরা-ফুসসিলাত, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৩৩) -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থ "সেই ব্যক্তির চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আলরাহর পথে আহবান করে আর বলে আমি তো মুসলিম (আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণকারী) ।

আল্লাহ বলেননি যে আমরা হানাফী বা শাফেয়ী বা হাম্বলী বা মালিকী বা সালাফী অথবা আহলে হাদীস।

আল্লাহ এ কথা আবার (সুরা যুমার, অধ্যায় ৩৯, আয়াত ১২) -তে উল্লেখ করেছেন-
অর্থঃ শ্বলো, 'হে কিতাবের অনুসারীগণ! এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই/"

প্রথম সাদৃশটা কী? তা হচ্ছে
অর্থ "আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। কোনো কিছুকেই তার সাথে শরীক করি না।/
অর্থ আমাদের কেউ কাকেও আলাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না!" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে
অর্থ: যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমপর্ন করলাম।/"

যখন আমরা কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলি তখন কোনো সমস্যা হলে বলবো, "তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পনকারী।"

এরপর সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। সব মিলিয়ে পবিত্র কুরআনের ৭টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বলেছেন, নিজেকে মুসলিম বলো, বলো তোমরা মুসলিম।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের ৩৩, সূরা যুমারের ১২, সূরা আলে ইমরানের ৬৪, সূরা বাকারার ১৩৬, সূরা আম্বিয়ার ১৩৮, সূরা কাসাসের ৫৩ ও সূরা আনকাবূতের ৪৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (পবিত্র কুরআনের ৭টি জায়গায়) আল্লাহ বলেছেন, "বলো যে, তোমরা মুসলিম।"
তাহলে মহভেদটা আসছে কোথা থেকে?
মুসলিম উম্মাহ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং নিজেদের একতা ও সংহতি রক্ষা করা ইসলামের একটি মৌলিক ফরয। তেমনি সুন্নাহর অনুসরণ তথা আল্লাহর রাসূলের শরীয়ত এবং তাঁর উসওয়াহ ও আদর্শকে সমর্পিত চিত্তে স্বীকার করা এবং বাস্তবজীবনে চর্চা করা তাওহীদ ও ঈমান বিল্লাহর পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরয।

সুতরাং সুন্নাহর অনুসরণ যে দ্বীনের বিধান উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিভেদ ও অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকাও সেই দ্বীনেরই বিধান। এ কারণে এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ ও সংঘাত হতেই পারে না। সুতরাং একটির কারণে অপরটি ত্যাগ করারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এখন আমরা এই দুঃখজনক বাস্তবতার সম্মুখীন যে, হাদীস অনুসরণ নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণকে এবং তাদের সংকলিত ফিকহী মাযহাবসমূহকে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ ফিকহের এই মাযহাবগুলো হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধানেরই ব্যাখ্যা এবং তার সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ। মূলে তা ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মাযহাব, যা উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মপরম্পরা তথা তাওয়ারুছের মাধ্যমে চলে এসেছে।
এই অবস্থা প্রমাণ করে, আমাদের অনেকে সুন্নাহ অনুসরণের মর্ম ও তার সুন্নাহসম্মত পন্থা এবং সুন্নাহর প্রতি আহবানের সুন্নাহসম্মত উপায় সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে উদাসীন। তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির সঠিক উপলব্ধি এবং ঐক্যবিনাশী বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার।

সুন্নাহর অনুসরণ এবং উম্মাহর ঐক্য দুটো বিষয়ই অনেক দীর্ঘ এবং উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে চলমান অবহেলা ও ভুল ধারণা ব্যাপক। সবকটি দিক নিয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে শুধু প্রবন্ধের শিরোনাম (মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি রক্ষা; সুন্নাহসম্মত পন্থায় সুন্নাহর প্রতি আহবান)-এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক কথা বলার এবং ইখলাস ও ইতকানের সাথে উপস্থাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্ব

ইসলাম তাওহীদের দ্বীন এবং ঐক্যের ধর্ম। এখানে শিরকের সুযোগ নেই এবং অনৈক্য ও বিভেদের অবকাশ নেই। ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ-এক আল্লাহর ইবাদত, এক আল্লাহর ভয়।

এই তাওহীদের সমাজকে ইসলাম আদেশ করে সীরাতে মুস্তাকীম ও সাবীলুল মুমিনীনের উপর একতাবদ্ধ থাকার, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করার, ইজমা ও সাবীলুল মুমিনীনের বিরোধিতা পরিহার করার এবং এমন সব কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার, যা উম্মাহর একতা নষ্ট করে এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।

সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কুফর এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ।

কথাগুলো যদিও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত আকীদা তবুও পুনস্মরণের স্বার্থে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

(এ প্রসঙ্গে মূল প্রবন্ধে আটটি সূরার সর্বমোট ২৭টি আয়াত রয়েছে। এখানে আরবী পাঠ ও তরজমাসহ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

۞ َإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُون

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (তবে) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।-সূরাতুল আম্বিয়া (২১) : ৯২-৯৩

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين۞ ٍ

(তরজমা) 'নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে

বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেয়ালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবে থাকতে দাও।-সূরা মুমিনুন (২৩) : ৫২-৫৩

উপরের দোনো জায়গায় নবীগণ যে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে উম্মত একটিই। আর তা হচ্ছে তাওহীদের উম্মত। সূরা ইউনুস (১০ : ১৯) ও সূরা বাকারায় (২ : ২১৩) বলা হয়েছে যে, আদিতে সকল মানুষ এ সমাজেই ছিল। পরে লোকেরা কুফর ও শিরক অবলম্বন করে আলাদা উম্মত, আলাদা সমাজ বানিয়ে নিয়েছে।

ঐক্য ও সংহতি মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহতায়ালা ও শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন।
: তাওহিদের পরে মুমিনদেরকে যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তাগিদ দেওয়া হয়েছে তা হলো- ঐক্য।
তাই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাওহীদ। تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُم (তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে) বাক্যে আকীদায়ে তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক ও অকাট্য আকীদা ও বিধানসমূহ (জরুরিয়াতে দ্বীনের) অস্বীকার বা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আলাদা মিল্লাত ও আলাদা উম্মত সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে।

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞

(তরজমা) তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীনই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন নূহকে এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে; যে, কায়েম রাখ এই দ্বীন এবং তাতে সৃষ্টি করো না বিভেদ। (তা সত্ত্বেও) মুশরিকদের তুমি যে দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুভার মনে হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং যে আল্লাহর দিকে রুজু হয় তাকে নিজ দরবার পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য দান করেন।

এবং মানুষ যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা হয়েছে তাদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পরই, পারস্পরিক শত্রুতার কারণে। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পূর্বেই স্থির না থাকত তবে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা এ সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে।
সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি ঐ বিষয়ের দিকেই মানুষকে আহবান কর এবং অবিচল থাক, যেরূপ তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো তর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন।-সূরাতুশ শূরা (৪২) : ১৩-১৫

দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অর্থ, তাওহীদ বা অন্য কোনো মৌলিক বিষয় সরাসরি অস্বীকার করে কিংবা তাতে অপব্যাখ্যা করে তাওহীদের উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

হক সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পর এ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কেবল জিদ ও হঠকারিতার কারণেই হয়ে থাকে। শাখাগত বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক যে মতপার্থক্য তা এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ অনেক শাখাগত বিধানের ক্ষেত্রে স্বয়ং নবীগণের শরীয়তেও বিভিন্নতা ছিল। অথচ তাঁদের সবার দ্বীন ছিল এক। তাঁরা সবাই ছিলেন তাওহীদপন্থী এবং অভিন্ন।

অন্য অনেক আয়াতের মতো উপরের আয়াতগুলোতেও স্পষ্ট নির্দেশনা আছে যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হতে পারে না। এখানে মতভেদ অর্থই বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।

আর এই বিভেদের দায় ঐ মতভেদকারীকেই বহন করতে হবে। যারা হকপন্থী, তাদেরকে নয়। কারণ ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও মৌলিক আকিদা ও বিধান। যারা এর উপর আছে তারা তো মূল পথেই রয়েছে। যারা মতভেদ করেছে তারা এই পথ থেকে সরে গেছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাওহীদের বিষয়ে বা দ্বীনের অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ে হক থেকে বিচ্যুত হওয়া বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা খেয়ালখুশির অনুগামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে ইসলামের অতুলনীয় ও ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাটিও লক্ষণীয় যে, যারা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হল তাদের সাথেও জুলুম-অবিচার করা যাবে না; তাদের সাথেও ন্যায়বিচার করতে হবে।

ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সংঘবদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করা ইসলামের নির্দেশনা।

এ সর্ম্পকে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমারা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) আঁকড়ে ধর (ঐক্যবদ্ধ হও) এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ' -সূরা আল ইমরান: ১০৩

ঐক্য সর্ম্পকে রাব্বুল আলামিন কোরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন, 'তোমরা সেসব লোকদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

' -সূরা আল ইমরান: ১০৫

ঐক্য প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে কারিমের আরও কিছু আয়াত হলো-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং কখনো মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ো না, যারা তাদের দ্বীনকে টুকরো করে দিয়েছে এবং নিজেরা নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, এদের প্রত্যেকটি দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়েই মত্ত। ' -সূরা তাওবা: ৩১-৩২

'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। ' -সূরা হুজরাত: ১০

'এই যে তোমাদের জাতি, এতো একই জাতি, আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই দাসত্ব কর। ' -সূরা তওবা: ৯২

হাদিসের আলোকে মুসলিম উম্মাহ 'র ঐক্য

ঐক্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কারিমের এক নির্দেশনা থাকার পরও বর্তমানে মুসলিম সমাজের ঐক্যের অভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম জাতি এক প্রাণ, এক দেহ- এই চেতনাবোধ দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আসছে। ইসলামে মুসলমানদের পারস্পরিক সর্ম্পক ভ্রাতৃত্বের। এ সর্ম্পকের ভিত্তি ইসলামের একটি স্তম্ভের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে কেউ তার স্বীকৃতি দিবে সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে মহান আল্লাহতায়ালা এবং হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জোর তাগিদ দিয়েছেন।

হজরত হারিছ আল আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, স্বয়ং রব আমাকে ওইগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে- সংঘবদ্ধ, আমিরের নির্দেশ শ্রবণ, নির্দেশ পালন, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধতা ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে গেছে সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলেছে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত কায়েম এবং সাওম পালন করা সত্ত্বেও? এর উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, নামাজ কায়েম এবং রোজা পালন এবং মুসলমান বলে দাবি করা সত্ত্বেও। ' –সুনানে তিরমিজি

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম অংশে বসবাস করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে। ' –তিরমিজি

হজরত রাসূলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন কর, সংঘবদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন-যাপন করো না, কারণ বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করলে শয়তানের কু-প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ' -আবু দাউদ ও ইবনে মাজা

হজরত রাসূলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'মুমিনগণ অপর মুমিনের জন্য একটি প্রাচীরের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে। এরপর তিনি এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলে প্রবিষ্ট করেন। ' –সহিহ বোখারি ও মুসলিম

হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। ’ –মুসলিম
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তিনজন লোক কোনো নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে আমির না বানিয়ে থাকা জায়েজ নয়। ’ –আহমদ

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি মুমিনদের দেখবে একটি দেহের মতো। যদি দেহের কোনো একটি অংশ আহত হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংশও তা অনুভব করে। ’ -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

হজরত রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘মুমিনগণ একজন মানুষের মতো, যার চোখ আক্রান্ত হলে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়; আর তার মাথা আক্রান্ত হলে সমস্ত শরীর আহত হয়। ’ –সহিহ মুসলিম

ঐক্য প্রসঙ্গে ইসলামের এমন নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম মিল্লাত আজ শতধাবিভক্ত। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা আশা করি, মুসলমানরা বিষয়টি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।
। আরবদের প্রবাদবাক্য আছে,

من قل ذل

"যারা (সংখ্যায়) কম হয়, তারা (শত্রুর হাতে) অপমানিত হয়।"

কাইস ইবনু আসিম বলেন,

إِنَّ الْقِدَاحَ إِذَا اجْتَمَعْنَ فَرَامَهَا بِالْكَسْرِ ذُو حَنَقٍ وَبَطْشٍ أَيْدِ عَزَّتْ فَلَمْ تُكْسَرْ وَإِنْ هِيَ بُدِّدَتْ فَالْوَهْنُ وَالتَّكْسِيرُ لِلْمُتَبَدِّدِ

"কয়েকটি তীর যখন একত্র হয়, তা অনেক শক্ত হয়ে যায়। তীরগুলো ভেঙে দেওয়ার জন্য কঠিন ও মজবুতভাবে তীর নিক্ষেপ করলেও কেউ আর ভাঙতে পারে না। আর যদি তীরগুলো ভেঙে দেওয়াও হয়, তাহলে যে ভাঙে তাকেও দুর্বল হতে হয়, ভেঙে যেতে হয়।"

৫. ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'সুনানু আবি দাউদ'-এ উল্লেখ করেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته
"আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে অপর মুমিনের কোনো ক্ষতি হতে দেয় না এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রক্ষা করে'।"

ঐক্যের পথে আসল বিপদ

ঐক্যের পথে আসল বিপদ, কোরআন মজিদে এরসাদ হয়েছে,

(اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون - (المائده

(আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিরাশ হ'য়ে পড়েছে, অতঃপর তাদের ভয়ে ভীত হয়ো না। এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করো।)

এই আয়াত ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্বের পর নাযিল হয়েছে। এর মূল কথা হ'লো, ইসলামের বিজয়ের পর কাফিরদের সামরিক শক্তির চরম পরাজয় হয়ে গেছে। তাদেরকে ভয় করার কোন কারণ নেই, তারা আর সামরিক ভাবে তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। তবে তোমাদের ঐক্যের পথে আসল বিপদ হলো, তোমাদের চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি। কোরআনের আয়াতে (একমাত্র আমাকেই ভয় করো) শব্দের দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তোমাদের পরিশুদ্ধির রক্ষাকবজ। ইসলামী চিন্তাধারার পরিশুদ্ধিই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সাফল্যের রক্ষা কবজ। অন্য ভাষায় বলতে হয় যে বাইরের সামরিক শক্তির ভয় আসল বিপদ নয়, বরং আসল বিপদ হ'লো ইসলামী আকিদার বিকৃতি। হাদিস শরীফেও একই কথা বলা হয়েছে,

و ان الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب (শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে আরব উপদ্বীপে আবার তার উপাসনা করা হবে)
এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, আরব উপদ্বীপ থেকে পৌত্তলিকতার বিলোপ ঘটেছে। তাদের তরফ থেকে আর কোন ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের তরফ থেকে ভয়ের

কারণ বিদ্যমান ছিলো ও আছে। রাজনৈতিক সংকটের চাইতে সাংস্কৃতিক সংকটের পথই বেশী বিপদের কারণ। রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন এভাবে;

اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করে দাও)

রাসূলেপাকের তিরোধানের পূর্বে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যে সর্বশেষ কথাটি উচ্চারিত হয়েছিলো, তা হলো;

- قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان على أرض العرب (আল্লাহপাক ইহুদী ও খৃষ্টানদের সর্বনাশ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে (অর্থাৎ নবীকে তারা উপাস্যের স্থানে সমাসীন করেছে) আরব ভূখন্ডে দুইটি দ্বীনের অবস্থান থাকবে না।)

উপরোল্লিখিত কয়েকটি হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় আরবের ভূখন্ড থেকে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটলেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের চিন্তাধারার আগ্রাসন সংকট উম্মতে মুহম্মদীর ঐক্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে বিদ্যমান। এ জন্যেই রাসুলুল্লাহ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত বিভেদ, তা অতীতের হোক বা বর্তমানের, সবই ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেরই ফল, কোথাও এই আগ্রাসন সুস্পষ্ট আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে দূরে সরে থাকার জন্যেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিচের কয়েকটি আয়াত থেকে আরো স্পষ্টতর হ'য়ে যায় যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিকতার ও নির্ভরশীলতার সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না। এরসাদ হয়েছে;

يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قديدت

- البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، قدبينا لكم الآيت إن كنتم تعقلون -(ال عمران (١١٨) (হে ঈমানদার লোকেরা, মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে নির্ভরযোগ্য সাথী বানাবে না,

তারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপূর্ণ বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে। আর যা তাদের মনের মধ্যে লুকায়িত তা আরো জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে তুলে ধরেছি-যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।)

لا يتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا

ان تتقوا منهم لغة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير - (ال عمران (٢٨) (ঈমানদার লোকেরা যেনো কাফিরদের বন্ধু না বানায় মুসলমানদের ব্যতিরেকে, যারা এমনটি করে তাদের আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে যদি তোমরা তাদের কোন অনিষ্টের আশংকা করো, তবে সাবধানতার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তোমাদের সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।)

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين الريدون ان تجعلوا الله عليكم

سلطانا مبينا - (النساء - ١٤٣)

(হে ঈমানদারগণ তোমরা মুমিন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না, তোমরা কি এমনটি করে তোমাদের নিজেদের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করবে?) يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم

فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين (المائدة(٥٠)

(হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না)

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين - (المائدة (٥٦) (হে ঈমানদারগণ, যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে উপহাস ও খেলা করে, তারা তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও কাফিরদের মধ্য থেকে হবে। আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।)

উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহে ও হাদিসে রাসুলে কয়েকটি বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট রায় পাওয়া যায়, তা হলো,

(১) আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বহিষ্কার করা হয়েছে রাসুলের নির্দেশে, তাই ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য ঐ এলাকায় প্রবেশ চিরদিনের জন্য নিষেধ। কোন অবস্থাতেই তাদের প্রবেশাধিকার ও অবস্থান বৈধ হতে পারে না।

(২) ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে তাদের তরফ থেকে কল্যাণ কামনা করা অবৈধ। অন্য কথায় তারা কখনও মুমিনদের বন্ধু হতে পারে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা বন্ধু বলে মনে হলেও তারা হলো আসল শত্রু। ইসলামী ইতিহাসের যে কোন পাঠক এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য।

(৩) মুসলমানদের পারস্পরিক কোন্দলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যস্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তি বলতে গোটা পাশ্চাত্য জগতই বুঝায়। তাদের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিকভাবে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা নিষেধ।

(৪) দেশ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে সকল কাফিরদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। ইসলাম বিরোধী শিবির, তারা ইহুদী, খৃষ্টানই হোক কিংবা সাধারন কাফির সবাই একে অপরের বন্ধু ও সাধারনভাবে মুসলমানদের শত্রু। তাদের শত্রুতার রোষানলে পড়ার জন্য শুধুমাত্র মুসলমান নামই যথেষ্ট, তারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়ে সত্যিকারভাবে মুসলিম হোক বা না হোক।

(৫) তাদের তরফ থেকে অনিষ্ঠতার সম্ভাবনা থাকলে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সার্বিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে হবে। সহ অবস্থানের স্বার্থে পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা, শান্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি, মৈত্রী ও সম্পর্ক ও এই কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের পরিপন্থি ব্যক্তি স্বার্থের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক অবশ্যি পরিতাজ্য। অন্য মুসলিম ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির ন্যায় সংগত অধিকারের যুপকাষ্টে কোন অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেন-দেনেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ময়দানে

সহযোগিতা কোরআন নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই করতে হবে। এই সীমা লংঘনের ফলেই আজ ইসলামী ঐক্য অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

স্থান, ভাষা, অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থ ও অপরাপর পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ বা জাতির অস্বিত্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের স্বার্থে তাদের অভিন্ন স্বার্থের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

কোরআনে বর্নিত এই মূলনীতি বিস্তৃতির ফলেই ইহুদী-খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুকরণের রোগ মহামারি রূপ ধারণ করেছে। আজ মুসলিম উম্মাহর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই রোগ সংক্রমিত। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি হিসাবে মুসলমানগণ নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে এই সর্বনাশা অনুকরণের ফলে।

যে পয়েনটে ঐক্যবধ্য হতে হবে

আর আপনারা হয়তো জানেন যে, দাওয়াহ দেওয়ার muster কী অথবা ইসলাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন কী বলছে? (সুরা- আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৪) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قُلْ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ বলো, হে কিতাবের অনুসারীগণ! এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই। প্রথম সাদৃশ্যটা কি? তা হচ্ছে- আমরা আনাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। কোনো কিছুকেই তার শরীক করি না। আমাদের কেউ কাউকে আলাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না।/

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আলাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমপর্ন করলাম।

আমি এর পূর্বে অনেক বক্তব্যেই বলেছি যে, পবিত্র কুরআনের এই আয়াত যা বলছে- “এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক” যদিও এখানে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে; আমার মতে এটা দ্বারা অমুসলিমদের যে কাউকে বুঝতে পারে। হতে পারে সে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ অথবা জৈন। আর যদি আপনি আরেক ধাপ এগিয়ে যান তাহলে এটা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ'র সকলের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে।

যখন মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে মতভেদ থাকে সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমাধান হলো-(সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়-৩,
আয়াত ৬৪)

[৩:৬৪] আল ইমরান

قُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقولُوا اشهَدوا بِأَنّا مُسلِمونَ

বায়ান ফাউন্ডেশন:
বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি’। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম’।

তাহলে কুরআনের এই আয়াতটি আমার মতে মুসলিম উম্মাহ'র জন্যও ব্যবহার করা যায়। এটাই ইসলাহ দেওয়ার সবচেয়ে সেরা উপায়। যাতে করে মুসলিমরা সবাই সরল পথে আসতে পারে।

সাধারণত আপনি যে মুসলিমকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে খাঁটি আর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোনটা? ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে সেরা জ্ঞানের উৎসটা কী
সে অবশ্যই উত্তরে বলবে- 'কুরআন'। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। সে হয়তো নিয়ম মেনে চলা মুসলিম না; এটা আমরা সবাই জানি এবং মানি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন- পবিত্র কুরআনের পরে জ্ঞানের সবচেয়ে খাঁটি উৎস কোনটা? উত্তর হচ্ছে- ‘হাদীস'। এতেও কোনো দ্বিমত নেই। হাদীসকে কেউ সুন্নাহ বলেও অভিহিত করে।

উল্লেখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর তথা কুরআন ও হাদীস যে জ্ঞানের প্রধান উৎস তা মুসলমানদের সকলেই মেনে নেবে বা মেনে থাকে, সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, হাদীসের কিছু প্রকারভেদ আছে। কিছু হাদীস আছে যেগুলোকে বলা হয় ‘সহীহ হাদীস’; আবার কিছু হাদীস আছে যেগুলো ‘যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস’ আবার এমনও কিছু হাদীস আছে যেগুলো ‘মাওযু তথা জাল হাদীস বা বানানো হাদীস' নামে অভিহিত। মুসলিমরা কোন হাদীসগুলো মান্য করবে? এ হাদীসগুলো মুসলিমরা মেনে চলবে যেগুলো সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস বা শক্তিশালী হাদীস।

এখানে তিনটি প্রশ্নের তিনটি উত্তরের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মত পার্থক্য নেই। সেগুলো হলো- জ্ঞানের এক নম্বর উৎস হচ্ছে- কুরআন, দুই নম্বর উৎস হাদীস আর এ হাদীসগুলোর মধ্যে যেটিকে আমি মানবো তা হলো- সহীহ হাদীস। এ প্রশ্নগুলোর এই একই জবাব মুসলিমরা দেবে সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন। অর্থাৎ এ কথাগুলোর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল

যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি আপনার ধর্ম কী? অথবা আপনি কোন মতবাদ মেনে চলেন? অথবা আপনার মাযহাব কী? বেশিরভাগ ভারতীয় মুসলিম বলে যে তারা হানাফী। অল্প কিছু মুসলিম হয়তো বলবে তারা শাফেয়ী। আর আমি যদি ভারতের বাইরের কোনো মুসলিমকে এ কথাগুলো জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তারা হয়তো হানাফী ও শাফেয়ীর পাশাপাশি বলবে যে তারা হাম্বলী বা মালেকী। তবে ভারতে বেশিরভাগ মুসলিম নিজেদেরকে হানাফী বলে পরিচয় দেয় আর কিছু শাফেয়ী বলে পরিচয় দেয়। এছাড়াও আরো কিছু ভাগ আছে কিন্তু এ দুটোই প্রধান।

এবার আমি পরের প্রশ্ন করি, ভাই আপনি কেন হানাফী? কেন আপনি শাফেয়ী নন? এ প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর পাই তা হলো- আমার বাবা-মা ছিলেন হানাফী। আমার বাবা হানাফী, আমার মা হানাফী সেজন্য আমিও হানাফী। আমি তখন সেই লোককে প্রশ্ন করি যে, আপনার

বাবা শাফেয়ী হলে কী হতো? সে তখন বলে, ভাই জাকির! আমার বাবা শাফেয়ী হলে আমিও শাফেয়ী হতাম। খুব সহজ উত্তর খুব ভালো কথা।
আর একটা সহজ প্রশ্ন, আর তা হলো- আপনার বাবা মা অমুসলিম হলে কী হতো? আপনি তখন কী হতেন? এ প্রশ্ন করলে সে অনেক সময় চুপ থাকে। আপনি আমাকে যুক্তিটা দিলেন, আপনার বাবা মা হানাফী তাই আপনিও হানাফী, আপনার বাবা মা শাফেয়ী তাই আপনিও শাফেয়ী; ঠিক আছে, এটা লজিক্যাল কথা। বাবা মা অমুসলিম হলে তখন কী হতো? সে অনেক সময় চুপ থাকবে। বলি, ভাই আপনি চুপ করে আছেন কেন? তখন সে নরম গলায় বলবে- তাহলে হয়তো আমি অমুসলিমই হতাম। নরমভাবে সে বলবে আমি হয়তো অমুসলিমই হয়ে যেতাম।

বর্তমানে আপনার বয়স হয়তো ৩০/৪০ বছর হবে আর এখন আমার প্রশ্নের আপনি উত্তর দিচ্ছেন- আপনি অমুসলিম হতেন; সেটা হোক হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন। কারণ আপনার বাবা একজন অমুসলিম এবং আপনার মা-ও একজন অমুসলিম
এখন আমার প্রশ্ন হলো- এতে করে আপনি মাফ পাবেন? সে কোনো কথা বলতে পারবে না, সে জবাব দিতে পারবে না। অর্থাৎ এ কথার উত্তর তার নেই। যদি বলেন, মাফ পাবেন? একথার উত্তর হচ্ছে- ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দুসহ যত অমুসলিম আছেন তারা মাফ পাবেন। কারণ বেশিরভাগের বাবা-মা-ই ছিলো অমুসলিম। সে কোনো কথা বলবে না। তারপর সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমাকে উত্তর দিবে যে, যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করেন তাহলে আমি মুসলিম হয়ে যাবো। আমি বললাম, ভালো; আল্লাহ হিদায়াত করলে আপনি মুসলিম হয়ে যাবেন; তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন, (সুরা- আনকাবৃত, অধ্যায়-২৯, আয়াত-৬৯) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-
وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹﴾

অর্থ: যারা আলাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে সংগ্রাম ও জিহাদ ফি সাবিলিললাহ করে। আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৎকমর্শীলদের সাথে আছেন।'

এখানে শর্ত হলো আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। যদি আপনি সংগ্রাম করেন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে হিদায়তে করবেন; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে আল্লাহ আপনার সামনে রাস্তা খুলে

দেবেন। তাহলে শর্ত হলো- আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনার রাস্তা খুলে দেবেন।

আপনারা গত কয়েকদিন দেখেছেন যে, অনেক অমুসলিম আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমিতো অমুসলিম পরিবারে জন্মেছি, এতে আমার দোষটা কোথায়?

আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম- আপনি যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে পূর্বে কৃত সব গুনাহের মাফ পাবেন। এতে আপনি একটা সুযোগ পাবেন। অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে এখনও করছেন ভবিষ্যতেও করবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি পূর্বের গুনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবেন। তাহলে মাফ পাওয়ার জন্য শর্ত হলো আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে।
কোনো অমুসলিমকে হয়তো আপনি বলেছেন যে, তাদের ইসলাম ধর্ম মেনে চলা উচিত সত্যকে পাওয়ার জন্য। এমতাবস্থায় যদি কোনোপ্রশ্ন করে, "আপনি কেনো মুসলিম?" এর জবাবে যদি আপনি বলেন, "আমার বাবা-মা মুসলিম তাই আমিও মুসলিম"। এরপর সে যদি আপনাকে বলে যে, সত্যিকরে বলুনতো, আপনি কি কখনও সত্যকে জানার চেষ্টা করেছেন?

এসব প্রশ্নের মুখোমুখী হওয়ার আগেই আপনার উচিত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ও ইসলামকে ভালোভাবে জানা। আর ইসলামকে ভালোভাবে জানতে হলে আপনাকে জানতে হবে কুরআন এবং হাদীস।

অমুসলিমদের পাশাপাশি মুসলিমদেরকেও বলবেন যে, আপনারা সত্যের পথে থাকুন

আমি কী বলতে পারি? আমি তাকে বলতে পারি যে, মাশাআল্লাহ! আপনার বাবা-মা হানাফী বা শাফেয়ী ছিলেন, তারাতো মুসলিম; আমার বাবা-মা-ও মুসলিম ছিলেন। আল্লাহর দয়া ও করুণা, আল্লাহামদুলিল্লাহ।

তাকে পরের প্রশ্ন করবো ভাই, আপনি বললেন আপনি একজন হানাফী। আপনার কোনটি বেশি ভালো? হানাফী বেশি ভালো নাকি শাফেয়ী বেশি ভালো? এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ মুসলিম বলবেন যে, চারটা মাযহাব বা মতবাদ চারজন আলেম প্রচলন করেছেন। সুন্নিদের মধ্যে চারটা আলাদা মাযহাব বা মতবাদ, তারা এ উত্তরটাই দেবে। সুন্নিদের মধ্যে চারটা মাযহাব- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারটা মতবাদই বারহাক্ক তারা চারজনই

সঠিক। কিছুলোক বলবেন হানাফী হলে ঠিক আছে, কেউ বলবেন শাফেয়ী হলে ঠিক আছে; তবে অধিকাংশ মুসলিম বলবেন যে, চারজন আলেমই ঠিক বলেছেন, তারা চারজনই সঠিক।

সুন্নিদের চার মাযহাবে মতপার্থক্যে ধরণ

আমি এখন একটা প্রশ্ন করি, যে প্রশ্নটার সাথে মোটামুটি সকলেই পরিচিত আর প্রশ্নটা কোনো কঠিন প্রশ্ন নয়, অনেকটাই সহজ। প্রশ্নটা হচ্ছে- ভাই যদি একজন মহিলা পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করে তা হলে তার অযু থাকবে কী না? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন শাফেয়ীকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে সে কী বলবে? সে বলবে যে, না তার অযু থাকবে না তা ভেঙ্গে যাবে। অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থায় হানাফী মাযহাব মতে অযু ভাঙ্গবে না আর শাফেয়ী মাযহাব মতে অযু ভেঙ্গে যাবে।

এবারে পরের প্রশ্ন। এ প্রশ্নটিও অত্যন্ত সহজ একটি প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন হচ্ছেপ্রিয় ভাইয়ের! দুটি কি এক সাথে সঠিক হতে পারে? একজন মুসলিমের জন্য অযু ভেঙ্গে যাবে যদি সে একজন মহিলাকে স্পর্শ করে আর অন্য একজন মুসলিমের অযু ভাঙ্গবে না; যদি সে অযু করা অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে। আমি এখন বলছি দুটি অবস্থাই কি সঠিক হতে পারে? আমি বলছি না যে, কোনটি সঠিক? যদি কোনটি সঠিক তা বলতে যাই তাহলে কুরআন হাদীসে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, আর তা হচ্ছে- দু পক্ষের কথাই কি সঠিক হতে পারে? আপনারা বলছেন, না। অর্থাৎ দুই পক্ষের কথাই সঠিক হতে পারে না। সহজ প্রশ্ন আর সহজ উত্তর।

যদি এই প্রশ্ন করি যে একজন শিক্ষক শেখালেন, ২+২=৪ আর অন্য একজন শিক্ষক শেখালেন ২+২=৫। তাহলে এ দুজন শিক্ষকের কথাই কি সঠিক হতে পারে? না, দুইজন শিক্ষকের কথাই ঠিক হতে পারে না। যে লোকের অংক সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সে হয়তো তাকে ঠিক বলতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তির অংক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে সে বলবে যে ২+২=৫ হতে পারে না; ২+২=৪ হবে। তাহলে প্রথম শিক্ষক বলেছেন ২+২=৪ আর অন্যজন বললেন ২+২=৫; দুজনের কথাই কি সঠিক হতে পারে? এর উত্তর হলো- না; দুজনের কথাই সঠিক হতে পারে না।

এখন যদি আপনাদের প্রশ্ন করি, একজন শিক্ষক বললেন ৩৭৫ এর সাথে ৬২৫ কে গুণ করলে হবে ১০,০০৫২৫; আর একজন শিক্ষক বললেন ৩৭৫ এর সাথে ৬২৫ কে গুণ করলে

হবে ১০,০০৫২৫ হবে না। এখানে দুজনের কথাই কি একসঙ্গে সঠিক হতে পারে? না, দুজনের কথাই সঠিক হতে পারে না। এটা বুঝার জন্য গণিতবিদ হতে হবে না। যদি জিজ্ঞাসা করি কার কথা সঠিক বা কে সঠিক কথা বলছে? তাহলে আপনি ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসাব কষে দেখবেন। যদি অংক ভালো পারেন, যদি লজিক্যাল হন তাহলে আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন কে সঠিক। আপনার নিকটে যদি ক্যালকুলেটর না থাকে, আপনি যদি হিসাব বের করতে না পারে তবুও দুজনের কথাই সঠিক হবে না। যদি আপনি জানতে চান যে এই দুজন শিক্ষকের মধ্যে কার কথা সঠিক? তাহলে ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে হিসাব করে বলতে পারবেন যে প্রথম জন অথবা দ্বিতীয় জনের কথা সঠিক।

একইভাবে যদি জানতে চান দুই মাযহাবের মধ্যে কার কথাটা সঠিক? হানাফী না কি শাফেয়ী? দুই মাযহাব কি একই সাথে সঠিক হতে পারে? উত্তর হলো না, পারে না। তবে কোন মাযহাবের কথাটা বেশি সঠিক? এটা জানতে হলে এ একই পদ্ধতি। আপনাকে দেখতে হবে খাঁটি উৎসগুলো; প্রথমত কুরআন, দ্বিতীয় হাদীস।

তাহলে উক্ত উত্তর দুটোর কোনটা সঠিক, হানাফী না কি শাফেয়ী? এটা সবার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যদি না আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে সংগ্রাম করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (সুরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৬) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۶﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রভত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পবর্্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পযর্্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র (জানাবাত অবস্থায়) থাকো, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে(গোসল করযে)..........
নামায আদায় করার জন্য অযু করাটা বাধ্যতামূলক। এরপর বলেছেন,

وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۶﴾

অর্থঃ "তোমরা যদি অসুস্থ থাকো অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ টয়লেট থেকে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, স্পর্শ করো এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তয়ামমুম করবে এবং তা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে।"

তায়াম্মুমের কথা বলা হচ্ছে কোনো পানি না থাকলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

এই আয়াতটায় যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে- কোনো মহিলা স্পর্শ করলে, এখানে আরবি শব্দ হলো o4! (লামাছ) মূল আরবি শব্দ 4৮4 (মাছা) এটার ওপর ভিত্তি করে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে, তাহলে আপনাকে অযু করতে হবে আর পানি না থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে। অথবা আপনাকে গোসল করতে হবে। এখানে অযু, গোসল ও তায়াম্মুম তিনটি অপশন। কোথায়ও পানি না থাকলে তায়াম্মুম করবেন।

এখন আরবি শব্দ ৮ (মাছা) এই শব্দটার দুটি অর্থ। অভিধান খুললে আপনিও দেখতে পারবেন মাছা শব্দের অর্থটা কী। এখানে দুটি অর্থ রয়েছে- ১. শারীরিক স্পর্শ, ২. সহবাস করা।
ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এই দুজন মহান আলেম, তারা খুব জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এই আয়াতটার অর্থ করেন, যদি কোনো মহিলাকে সহবাস করেন তাহলে আপনার অযু বা তায়াম্মুম করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এখানে তিনি 4 (মাছা) শব্দটার অর্থ নিয়েছেন সহবাস করা। এজন্য যদি আপনি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াতটার অর্থ করেন শারীরিক স্পর্শ। সুতরাং এখানে অর্থ হবে যদি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু বা তায়াম্মুম করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এখানে তিনি ৮ (মাছা) শব্দটার অর্থ নিয়েছেন স্পর্শ করা। এজন্য যদি আপনি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে।

তাহলে এখানে হানাফী মাযহাব মতে আপনি স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গবে না আর শাফেয়ী মাযহাব মতে আপনি কোনো মহিলাকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করলেও আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে। তখন আপনাকে আবার অযু করতে হবে।

এখন ৮ (মাছা) শব্দের দুটো অর্থ দুজন দুটো অর্থ নিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং প্রধান উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন। যদি কুরআন থেকে কোনো সমাধান না পান তাহলে আপনি পরের উৎসে যাবেন। আর পরবর্তী উৎস হচ্ছে- ‘হাদীস'। তবে আমরা যদি কুরআনের অন্যান্য

আয়াতগুলো দেখি তাহলে সেখানে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (সূরা- আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৪৭) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۴۷﴾

এখানেও এই ৮ (মাছা) শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মারিয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে- প্রধান ফিরিস্তা জিবরাইল (আ) তার কাছে এসে জানালেন যে, তোমার একটা পুত্র সন্তান হবে। মরিয়াম (আ) তখন উত্তর দিলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? আমার পুত্র সন্তান কীভাবে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? সেই শব্দ তথা 4৮ (মাছা) এখানেও আছে।

এখন আমাদের সবাই বুঝতে পারবেন, যখন মারিয়াম (আ) বললেন আমার পুত্র সন্তান কীভাবে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? তার অর্থ সহবাস করা, শারীরিক স্পর্শ বুঝানো হচ্ছে না। কারণ শারীরিকভাবে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই; বরং যদি কেউ সহবাস করে তাহলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেজন্য তিনি বললেন আমার সন্তান হবে কীভাবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? তখন উত্তর আসলো যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো কিছু স্থির করেন তখন বলেন- ১৫ (কুন ফাইয়াকুন), হও আর তখন হয়ে যায়। এখানে 4৮ (মাছা) শব্দটার অর্থ সহবাস করা।

এছাড়া আমরা যদি নবীজী (সাঃ)-এর হাদীস অধ্যায়ন করি, অর্থাৎ কুরআন বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের দ্বিতীয় উৎস হাদীস দেখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সে হাদীসটা যেন সহীহ হাদীস হয়। আমি একটি সহীহ হাদীস বলছিযা সুনানে আবু দাউদের ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। "আয়েশা (রা) বললেন, একবার নবীজী (সাঃ) তার একজন স্ত্রীকে চুমো দিয়ে নামাযে চলে গেলেন। তিনি আবার অযু করেননি। তখন উরওয়া (র।) বললেন, সে শ্রী তো আপনি ছাড়া কেউ নন। আয়েশা (রা) তখন হেসে উঠলেন/" তার মানে সে স্ত্রী তিনি ছিলেন আর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাহলে আবু দাউদের ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীসে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটি সহীহ হাদীস হিসেবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন। আর এটাকে সহীহ হাদীস হিসেবে দেওয়া বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আলবানী (র)-ও রয়েছেন।

এখানে বলা হয়েছে- আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) তিনি অযু করা অবস্থায় ছিলেন এবং এমতাবস্থায় তিনি আয়েশা (রা)-কে চুমো দিয়ে নামাযে গেলেন কিন্তু তিনি আর অযু করলেন না। এটাই প্রমাণ করে 'শরীরিক স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে না'। এরকম আরো সহীহ হাদীস আছে। বুখারীর ১ নং খণ্ডের ৫১৯ নং হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে- সেখানে বলা হয়েছে, "আয়েশা (রা) বণর্না করেন, আমি ছিলাম নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং কিবলার মাঝামাঝি এমতাবস্থায় নবীজী (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজদাহ দেওয়ার সময় আমার পা ধরে ধাকা দিলে আমি সরে গেলাম আর তিনি সিজদাহ করলেন।'

এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবীজী (সাঃ) নামাযরত অবস্থায় আয়েশা (রা)-কে স্পর্শ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে- অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যায় না।

এখন আপনাদের প্রশ্ন করি উল্লেখিত মাসয়ালায় কার মত সঠিক? ইমাম আবু হানিফা না কি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর? উত্তর হচ্ছে- ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতটাই সঠিক। কারণ তার মতটা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বর্ণনার সাথে মিলে যায়।

এমতাবস্থায় কেউ আমাকে বলতে পারেন, তাহলে কি ইমাম শাফেয়ীর কথাগুলো ভুল? আমি ইমাম শাফেয়ী (র)-কে শ্রদ্ধা করি, আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং ভালোবাসি। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যদি কেউ কুরআন

হাদীস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ধর্ম বিষয়ে কোনো ফয়সালা দেয় এবং তা সঠিক হয় তাহলে সে দুটো পুরষ্কার পাবে আর যদি ফয়সালা ভুল হয় তাহলে একটি পুরষ্কার পাবে। অর্থাৎ কোনো বিশেষজ্ঞ মুফতি যদি কোনো ফতওয়া দেন আর তা সঠিক হয় তাহলে সে দুটো পুরষ্কার পাবে আর যদি ফতওয়া ভুলও হয় তবে একটি পুরষ্কার পাবে।

আমি বলছি না যে, ইমাম শাফেয়ী (র) জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন এবং কুরআন হাদীস সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, যে সময় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) বেঁচে ছিলেন সে সময় সকল হাদীস সংগ্রহ করা হয়নি। হাদীস সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে আরো আগে এবং শেষ হয়েছে অনেক পরে।

এমন হতে পারে আবু দাউদের এই হাদীসটা অর্থাৎ ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীস এবং বুখারীর ১ নং খণ্ডের ৫১৯ নং হাদীসটি ইমাম শাফেয়ীর নিকট পৌঁছেনি। যেহেতু হাদীসটি তার নিকট পৌঁছেনি তাই তিনি দুটো অপশনের একটি বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি শারীরিক স্পর্শটাকে সহবাস অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু হাদীসটি তার নিকট পৌঁছেনি।

আর একটা উদাহরণ দেই; আপনাদের প্রশ্ন করি যে, নামায পড়ার সময় যেখানে শব্দ করে পড়তে হয়, যেমন- ফজর, মাগরীব ও এশার নামাযে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করেন, এখানে হানাফী মাযহাব যেটা করে তা হলোযখন তারা জামাতে নামায আদায় করে তখন তারা ‘আমিন’ শব্দটা আস্তে বলে। ইমাম আবু হানিফার মতে অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মতে ‘আমিন’ শব্দটা আস্তেবলতে হবে, মনে মনে পড়তে হবে, জোরে পড়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ীর মত অনুযায়ী জামাতে নামায আদায়ের সময় ‘আমিন' শব্দটা জোরে পড়তে হবে। অর্থাৎ ফজর, মাগরিব আর এশার নামাযে হানাফী মাযহাবের মতানুসারীরা শব্দ করে আমিন বলে না আর শাফেয়ী মাযহাবের মতানুসারীরা শব্দ করে আমিন বলে।

এখানে কারা সঠিক? যদি না জানেন তাহলে কুরআন এবং হাদীস দেখবেন। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত দেখি না, যেখানে বলা হয়েছে ‘আমিন’ আস্তে বা জোরে পড়তে হবে। তাহলে এখানেও আমরা পরের উৎসটা দেখবো আর সেটা হলো হাদীস।

সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ১১১ নং পরিচ্ছেদের ৭৮০ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, সুরা ফাতিহা শেষ বলো তাহলে তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'
পরের হাদীসটা সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ১১২নং পরিচ্ছেদের ৭৮১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "নবাজা মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো আমিন বলার সময়ে যদি ফেরেজডাদের মধ্যেও কেউ আমিন বনে, তোমাদের অতীতের সব ৬ঙুনাহ ক্ষমা করা হবে।'

পরের আরো একটা হাদীস সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ৭৮২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ?) বলেছেন, যখন ইমাম বললেন, ১১৩ ১; ৮ ০+) +৯ (গাইরিল মাগদ্রবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বয়ারিন) শব্দ করে আমিন বলো! তোমাদের আমিন বলার সময়ে যদি ফেরেতাদের মধ্যেও কেউ আমিন বলে, তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হত"

আমি এখানে সহীহ বুখারী থেকেই তিনটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিলাম যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে শব্দ করে আমিন বলতে হবে। একইভাবে সহীহ মুসলিমে সব মিলিয়ে ৬টি হাদীস আছে এ বিষয়ে। যদি সহীহ মুসলিম পড়েন তাহলে দেখবেন সেখানে ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে ১১৬ নং পরিচ্ছেদের ৮১১ নং হাদীস থেকে ৮১৬ নং হাদীস পর্যন্ত মোট ৬টি হাদীস বলছে যে, শব্দ করে 'আমিদ'' বলতে হবে।
তাহলে আপনাদেরকে আমি বুখারী ও মুসলিমের মোট ৯টি হাদীসের রেফারেন্স দিলাম যেখানে বলা হয়েছে- শব্দ করে 'আমিন' বলতে হবে।

এখন আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, এখানে কে সঠিক? ইমাম আবু হানিফা না কি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত। উত্তর হচ্ছে- শাফেয়ী মাযহাবের মতটাই সঠিক। যেটা কুরআন এবং হাদীসের সাথে মিলে যাবে সেটাই মানবেন।

এবার আমি আমার প্রশ্নে আসি, প্রথম প্রশ্নটা হলো- অযু ভেঙ্গে যায় কি না? যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে বসে অথবা কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে? চিন্তা করুন যদি কোনো নও মুসলিম আমাকে জিজ্ঞাসা করে অথবা আমি তাকে স্পর্শ করি তাহলে আমাকে কি আবার অযু করতে হবে? আমার অযু কি ভেঙ্গে যাবে? তাহলে তাকে কি আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, আপনার বাবা হানাফী নাকি শাফেয়ী? তার বাবা তো ছিলো

অমুসলিম; তাকে কি বলবো? তাকে তাহলে বলতে হবে কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী যেটা সঠিক সেটা। এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ এবং রাসূলের নিকটে তথা কুরআন এবং হাদীসের কাছে। কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখবো তাহলে উত্তরটা পাবো।

আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারে দ্বিতীয় প্রশ্নটা তথা শব্দ করে আমিন বলা নিয়ে। এখানে হানাফী এবং শাফেয়ীর মতামত ভিন্ন ভিন্ন। শাফেয়ী মাযহাব শব্দ করে আমিন বলে আর হানাফী মাযহাব নিরবে আমিন বলে। এখানে বলতে পারেন, তাহলে কি বলেন ইমাম আবু হানিফা ভুল বলেছেন? উনি কি বিষয়টা জানতেন না? নাউজুবিল্লাহ। আমি তাকে শ্রদ্ধা

করি, সম্মান করি এবং ভালোবাসি। তবে ব্যাপারটা এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে ভুল করেছেন। আমি জানি যে, যে হাদীসগুলোর কথা আমি বললাম সহীহ বুখারী ও মুসলিমের, হয়তো সে হাদীসগুলো তার কাছে পৌঁছেনি।

আমি আপনাদের আগেও বলেছি, আমাদের নবীজী যখন বেঁচে ছিলেন পবিত্র কুরআন তখন সর্ম্পুণভাবে লিপিবদ্ধ ছিলো; আর একাজের তদারকি নবীজী নিজেই করেছিলেন। তার পূর্ণ তদারকিতেই এই পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিলো আর কথাগুলো অর্থাৎ হাদীস লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করেননি এ কারণে যে, তাহলে কুরআনের সাথে হাদীসগুলো মিশে যেতে পারে।

পরবর্তীতে যখন তিনি ইনতিকাল করলেন আর লোকজন যখন তার কথাগুলো উদ্ৃতি দিতে শুরু করলো এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করলো যা নবীজী হয়তো বলেননি, তখন সাহাবীগণ ভাবলেন ঠিক আছে এখন থেকে আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো যে নবীজী এ কথা বলেছেন কি না। তাই হাদীস লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছে নবীজী (সাঃ)-এর ইনতিকালের পরে। আর এই চারজন ইমামের সময়ে- অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ সবাইকে শান্তিতে রাখুন) তখনও হাদীস লিপিবদ্ধ হচ্ছিলো; তখনও সেটা শেষ হয়নি।

পরবর্তীতে ইমাম বুখারী আসলেন, ইমাম মুসলিম আসলেন, ইমাম আবু দাউদ আসলেন, তিরমিযি আসলেন; আর এভাবে হাদীসের সংগ্রহ আরো সমৃদ্ধ হলো। যা ছিলো উল্লেখিত চারজন ইমামের অনেক পরের ঘটনা। তাই তারা সে সময়ে যতটুকু জানতে পেরেছেন সেটার উপরেই মতামত দিয়েছেন।

এখন আপনি বলতে পারেন ভাই জাকির, আপনি কি ইমাম আবু হানিফার না কি? (আল্লাহ তাদের দুজনকে শান্তিতে রাখুন)। আমি বলবো- না, মোটেও না। আমি নিজেকে কখনই তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করি না। তাদের তুলনায় আমি কিছুই না। তারা নবীজী (সাঃ)-এর অনেক কাছে ছিলেন। তাদের জ্ঞান আমাদের সাথে কোনোভাবে তুলনাই চলে না। জীবিত কোনো মানুষের জ্ঞানের সাথে তাদের জ্ঞানের তুলনা চলে না।

তবে বুঝতে হবে যে, হাদীস সংগ্রহ করার কাজ সেই সময়েও চলছিলো। তাই এই চারজন ইমামও বলেছেন, আর কোনো মুসলিমই বলতে পারবে না যে, সে সবগুলো সহীহ হাদীস জানে।

আর এখনকার সময়টা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ; এখন অনেক সহজ। সেই সময়ে অর্থাৎ ইমামদের সময়ে কোনো হাদীস সংগ্রহ করতে হয়তো যেতে হতো কয়েকশ কিলোমিটার অথবা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। আর তা লিখে রাখতে হতো চামড়ার বা ছোট কোনো কাপড়ে অথবা গাছের ছালে। সেই সময় ফটোস্ট্যাট মেশিন ফিলো না; আর এখন ফটোস্ট্যাট মেশিন আছে, ফ্যাক্স আছে, ই-মেইল আছে যার মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ফ্যাক্স করতে পারেন, ই-মেইল করতে পারেন যেটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এতো উন্নত ছিলো না; আর এখন সবগুলো সহীহ হাদীস মাত্র একটি সিডিতে পেতে পারেন। পূর্ণ বুখারী, পূর্ণ মুসলিম একটি ডিস্কে পেতেও আপনার কোনো সমস্যা নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ১০ লাখ হাদীস মাত্র ১ সিডিতে কপি করা আছে এবং এখানে ভাগ করা আছে সহীহ, যয়ীফ, মওযু।

যেহেতু এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ তাই আমরা অনেক সহজেই হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার জানতে পারি যা সে আমলে মোটেও সহজ ছিলো না।

মনে করুন, এখন একজন ছাত্র সে পাস করলো বিএসসি (ব্যাচেলর অব সাইন)। সে এখন বিজ্ঞানে আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে অনেক বেশি জানে। আইজ্যাক নিউটন হলেন পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী। মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছেন 'দি হান্ড্রেড' (পৃথিবীর সেরা একশ' জন) নামে। এই বইতে তিনি এক নম্বরে স্থান দিয়েছেন আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং দুই নম্বরের স্থান দিয়েছেন স্যার আইজ্যাক নিউটনকে।
যে কেউ কি বিএসসি পাস করার পর বলবে যে, আমি স্যার আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে বেশি জানি? সে হয়তো এমন অনেক কিছু জানেন যা আইজ্যাক নিউটন জানতেন না; তবে বিজ্ঞান

ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে বেশি জ্ঞানী তা সে অবশ্যই দাবী করতে পারবে না। কারণ বিজ্ঞানে আইজ্যাক নিউটনের ব্রেন ছিলো অসাধারণ; এমনকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীদেরও সে ব্রেন নেই। তবে তার সময়ে বিজ্ঞান জানার রিসোর্স খুব কম ছিলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তার অবদান অভূতপূর্ব।

আর এজন্য তাকে বলা হয়েছে ইতিহাসের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন। তবে বর্তমানের একজন বিএসসি গ্রাজুয়েট নিউটনের চেয়ে বেশি জানে; কারণ এখন জানার রিসোর্স বেশি যা তাকে অল্প পরিশ্রম আর কম ব্রেনেও বেশি জানতে সাহায্য করেছে। বর্তমানের একজন বিএসসি, সে নিউটনের সূত্রগুলোও জানে, তার কারেকশনগুলোও জানে। নিউটনের থিউরিতে কিছু ভুল ছিলো যা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এসে সে সকল ভুল শুধরে দিয়েছেন। এ কারণে বর্তমানের একজন বিএসসি গ্রাজুয়েট নিউটনের চেয়ে হয়তো বেশি জানে, তাই বলে সে কিন্তু নিউটনের চেয়ে বড় বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে না।

একইভাবে আমরা বর্তমান সময়ে হাদীসগুলো খুব সহজেই পেতে পারি; কারণ, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীসহ বিশিষ্ট হাদীস সংকলকগণ হাদীস সংগ্রহ করে আমাদের পরিশ্রমকে কমিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অল্প পরিশ্রমে অনেক হাদীস জানার ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম আর মেহনতের সাথে সহীহ হাদীস, যয়ীফ হাদীস ও মাওযু হাদীসগুলো আলাদা করে গেছেন; যার কারণে কোনটি সহীহ আর কোনটি মাওযু হাদীস তা জানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। আর এ ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য আরো সহজ হয়েছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। তাই বলে আমরা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞানীদের চেয়ে বেশি জানি তা কিন্তু নয়। আমরা অবশ্যই তাদের চেয়ে বেশি জানি না। আমি এ দাবী করবো না এবং অন্য কোনো মুসলিমও এ দাবী করবে না।

মূলত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা এগুলো বেশি জানি তথ্য প্রবাহ বেশি হওয়ার কারণে। আমি এ বিষয়টি আপনাদেরকে পরিষ্কার করেই বললাম। আর একারণেই বলেছিলাম যে, বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। আমরা চারজন ইমামকেই শ্রদ্ধা করি আর তাদের সবাইকে আমরা ভালোবাসি।

নিজেদের সম্পর্কে চার ইমামের মুল্যায়ন

তারা চারজনই অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বিখ্যাত ইমাম। আমরা তাদের ভালোবসি, তাদেরকে সম্মান করি, সবাইকে শ্রদ্ধা করি। তারা বিখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞ।
কিন্তু আমরা যদি এই ইমামগণের জীবন কাহিনী পড়ি, তাহলে তাদের কথাগুলো আমরা বুঝতে পারবো সত্যিকারভাবে।

যদি আপনি ইমাম আবু হানিফার জীবন কাহিনী পড়েন, তিনি আগে এসেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করে ৭০১ খ্রিস্টাব্দে আর ইনতিকাল করেছেন ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১৫০ সালে)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, (আবু ইউসুফের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্র) হে ইয়াকুব! তারা অভিশপ্ত হোক যারা আমার মতামতগুলো লিখে রাখে। কারণ, আমি আজকে কিছু বললাম, কালই হয়তো সেটা বাদ দিতে পারি। হয়তো আগামীকাল একটা মতামত দেব আর পরের দিনই আবার সেটা বাতিল করবো।/

তাহলে ইমাম আবু হানিফা (র) আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন; তিনি তার মতামত লিখে রাখাকে উৎসাহিত করেননি, যদি না সেটার ব্যাপারে সবাই একমত হয়। যদি সব বিশেষজ্ঞ আর ছাত্ররা একমত হয় তাহলে তিনি সে ক্ষেত্রে লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া তার কোনো মতামত তিনি লিখে রাখা পছন্দ করতেন না।

আর ইমাম আবু হানিফার অন্য একজন ছাত্র ইমাম যুফারের কথা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, “আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমরাতো মানুষ, আমাদের মতামত ভুল হয়ে যেতে পারে। আমি আজকে যে মতটা দিয়েছি কাল সেটা বদলিয়েও দিতে পারি। আমি লোকজনকে নিষেধ করি কোনো প্রমাণ ছাড়া মতামতটা প্রচার করতে, যে মতামতটা আমি দিয়েছি/” আবু হানিফা (র) বলেছেন, কোনো প্রমাণ ছাড়া মানুষ যেন আমার মতামতটা প্রচার না করে। আমার ফতওয়া যেন প্রচার না করে। তার মানে যদি আপনি কোনো প্রমাণ না পান তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতামতগুলো প্রচার করবেন না।

তারপর আপনারা দেখবেন, ইমাম ইবনে আব্দুল বার, যিনি একজন শ্রদ্ধেয় ইমাম। তিনি লিখেছেন- “ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, সহীহ হাদাসই আমার মাযহাব। যদি তোমরা সহীহ হাদীস খুঁজে পাও তাহলে সেটাই মাযহাব। যদি তোমরা একটা সহীহ হাদীসও পাও তাহলে সেটাই আমার জীবন দর্শন, সেটাই আমার মাযহাব।/'

আর ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্র ইমাম মুহাম্মদের কথা অনুযায়ী, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, "যদি আমার কোনো ফতওয়া আমার কোনো একটা মতামত আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে যায় এবং তা রাসুল (সাঃ)-এর কথার বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার সে মতামত বাতিল করে দাও/'

তার মানে যদি ইমাম আবু হানিফার এমন কোনো ফতওয়া পান যেটা আল্লাহর কুরআন আর নবীজী (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই ফতওয়া বাতিল করে দিন।

আর লোকজন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো মহিলাকে যদি দুর্ঘটনাবশত স্পর্শ করি তাহলে কি আমার অযু ভাঙ্গবে? অথবা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে আমরা শব্দ করে আমিন বলবো কি বলবো না? তখন আমি বি, সুরা ফাতিহা গেম হলে আন বন্দ করে আমিন বলি হুমম ফজর, মাগরীব বা এশার নামাযে যখন বলে- Hele oy (গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম) আমি তখন শব্দ করে আমিন বলি। আর এ কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। কারণ, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। তাই আমি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সংক্রান্ত মতামত বাতিল করছি যে, তিনি বলেছেন- শব্দ করে আমিন বলো না আর আমি জোরে করে আমিন বলছি। এই কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। হানাফী শব্দের অর্থ- যে ইমাম আবু হানিফার শিক্ষাকে অনুসরণ করে। তাই আমি বলবো, আমি একজন পাক্কা হানাফী, ১০০% হানাফী; অন্যান্য হানাফীগণ হয়তো ৬০% বা ৭০%। সহীহ হাদীস হচ্ছে আমার মাযহাব।

আর ইবনে ওয়াহহাব (র)-এর কথা অনুযায়ী, তিনি বলেন- একদিন কিছু লোক ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করলো যে, অযু করার সময় কি আমাদেরকে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে খুব ভালো করে পানি পৌঁছিয়ে খিলাল করে পরিষ্কার করতে হবে? ইমাম মালিক (র) বললেন, নবীজী এটা করতেন না। তাই তা করার প্রয়োজন নেই। এরপর যখন সময় চলে গেল ইবনে ওয়াহহাব ইমাম মালিককে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিলেন যেখানে বলা হয়েছে- 'আমাদের নবীজী অযু করার সময় তার আঙ্গুলের ভেতরেও ভালো করে পরিষ্কার করতেন।' ইমাম মালিক (র) বললেন, ঠিক; এটাতো যে, অযু করার সময় কি আমাদেরকে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে খুব ভালো করে পানি পৌঁছিয়ে খিলাল করে পরিষ্কার করতে হবে? তিনি অবশ্যই বলতেন 'হাঁ', ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। এখানে তিনি মতামতটা বদলে ফেললেন।

তাহলে সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার মতামতটা সে অনুযায়ী হবে।

আর ইমাম মালিক (র) বলেছেন, "আমিতো একজন মানুষ! আমার ভুল হতে পারে। তবে মাঝে মধ্যে আমার কথা সঠিক। তবে আমার কোনো মতামত যদি আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।" একই কথা।

মালিকীরা যখন নামায আদায় করে তারা হাত দুটো ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু যদি আমরা আবু দাউদের হাদীস পড়ি, আবু দাউদের ১নং খণ্ড ৭৫৫ ও ৭৫৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "তোমরা হাত বাঁধো নাভীর নিচে/" তবে ইমাম আবু দাউদ এ দুটোকে যয়ীফ হাদীস বলেছেন।আবু দাউদের ১ নং খণ্ড ৭৫৬ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "তোমরা নাভীর ওপর হাত বাঁধো/" এটার ভিত্তি যয়ীফ হাদীসটার চেয়ে বেশ শক্ত অর্থাৎ এটার ভিত্তি উক্ত দুটোর চেয়ে সবল। কিন্তু পরের হাদীসটা আবু দাউদের ১ নং খণ্ড ৭৫৮ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "নামায আদায় করার সময় তোমরা হাত বাঁধবে তোমাদের বুকের ওপর/" যদিও এটা মুরসাল হাদীস কিন্তু এটাকে আরো বেশি সবল হাদীস বলা হয়েছে। মুরসাল মানে এখানে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাফসীরে বলা হয়েছে- এটা অন্যান্য হাদীসের চেয়ে বেশ মযবুত হাদীস।

আপনারা যদি ইবনে হুযাইফার হাদীস পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে- "নবীজী (সাঃ) নামাযের সময় বুকের ওপর হাত বাঁধতেন/" এটাও একটা মুরসাল হাদীস; হবে অন্যান্য হাদীসের পাশাপাশি এটাকেও শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী (র) সহীহ হাদীস হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

তাহলে নামাযের সময় কোথায় হাত রাখবেন সে ব্যাপারে মযবুত হাদীস হচ্ছে নামাযে "বুকের ওপর হাত রাখবেন"। তাই আমি যখন নামায পড়ি তখন আমার হাত রাখি বুকের ওপর। আর একারণেই বলেছি যে, আমি একজন পাক্কা মালিকী।
কারণ, ইমাম মালিক বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।

এখন যদি মালিকীগণ বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, তোমরা নামাযের সময় বুকের ওপর হাত রাখো; যদিও তিনি বলেননি তবুও ধরে নিলাম যে, তিনি বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যদি আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। তাই আমি ফতওয়াকে বাদ দিয়েছি। নামাযের সময় আমি আমার হাত রাখি বুকের ওপরে আর সেজন্য আমি ১০০% মালিকী এতে কোনো ফাক নেই। এক্ষেত্রে অন্যান্য মালিকীগণ হয়তো ৬০% বা ৭০% কিন্তু আমি ১০০% মালিকী, সম্পূর্ণ মালিকী।

আপনারা যদি ইতিহাস পড়েন তাহলে দেখবেন, আব্বাসীয় শাসনামলে আব্বাসীয় খলিফাগণ যখন শাসন করতেন তখন আবু জাফর আর খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালিকের ফতওয়াগুলো ছাপাতে চেয়েছিলেন; যেটাকে বলা হয় মুয়াত্তই মালিক। কিন্তু তিনি বললেন, না; কারণ নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। আমি যতটুকু জানি তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত দেই। যেহেতু নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছেন, তাই আমি জানি না যে, আমি যে ফতওয়া দেই তা-ই শতভাগ সঠিক। অর্থাৎ তিনি তার মুয়াত্তা লেখার জন্য খলিফাগণকে অনুমতি দেননি এবং তার সেই ফতওয়াকে সেই দেশের আইন বলে মেনে নিতে রাজি হননি।

এখন চিন্তা করুন, ইমাম মালিক (র) ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখতেন। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন।

এরপর আসেন ইমাম শাফেয়ী (র)। তিনি ইমাম মালিকের ছাত্র ছিলেন আর ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত বা ইমাম মালিকের মতামত অথবা ইমাম আওযায়ীর মতামত, তাহলে আগে দেখো যে, সেটা কোথা থেকে এসেছে; সেটার উৎসটা কোথায়। তিনি বলেছেন, আমার মতামত তোমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করো না, চোখ বুঝে আমাকে অনুসরণ করো না। যদি কোনো সহীহ হাদীস খুঁজে পাও তাহলে সেটাই আমার মাযহাব। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হচ্ছে সহীহ হাদীসের মাযহাব। তিনি বলেছেন, ‘‘যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া কুরআন এবং হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার মতামতটা বাতিল করে দাও/'

লোকজন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করার ব্যাপারে যে, কোনো মহিলা আমাকে স্পর্শ করলে বা আমি তাকে অযু অবস্থায় স্পর্শ করলে আমার কি অযু ভেঙ্গে যাবে? তাহলে আমি বলবো- না, এতে আমার অযু ভাঙ্গবে না। কারণ, এ

ব্যাপারে আবু দাউদ এবং মুসলিমে বেশ কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে যে, অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গবে না। আর এটা বলার পরও আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী। তার কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, "যদি তোমরা দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।" আর এ কারণে আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী। অন্যান্য শাফেয়ীরা হয়তো ৭০% বা ৮০% শাফেয়ী, হবে ১০০% নয়; কিন্তু আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী।

আর আপনারা ইতিহাস পড়লে দেখবেন, ইমাম শাফেয়ী (র) বাগদাদে অবস্থান করা অবস্থায় তিনি ফতওয়া নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ছিলো 'আল হুজ্জা'। পরবর্তীতে তিনি একবার মিশরে গিয়ে আবার ফিরে এলেন এবং তারপর তিনি ইমাম লায়েক ইবনে সা'দ এর ছাত্রদের অধীনে পড়াশোনা করলেন। এ সময় অনেক বিষয়েই তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, যার কারণে তিনি নতুন একটি বই লিখেন যার নাম হা'লুম। অর্থাৎ ইমামা শাফেয়ী প্রথমে একটি বই লিখেন অতপর ইবনে সা'দের ছাত্রদের নিকট পড়ার পর তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেলে আরো একটি বই লিখেন।

মানুষের অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে, ইমাম মাত্র চারজন। না, ইমাম মাত্র চারজনই নয় বরং আরো অনেক ইমাম ছিলেন যারা অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছাত্রদের ব্যাপক প্রচারের কারণে তারা চারজন প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

উক্ত চারজন ইমাম ছাড়াও আরো অনেক ইমাম ছিলেন যেমন, ইমাম লায়েক ইবনে সা'দ। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি বলেন, ফিকহ বিষয়ে ইমাম লায়েক ইবনে সা''দের জ্ঞান ইমাম মালেকের জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এটা বলতে পারলেও আমরা বলতে পারি না।

চতুর্থ ইমাম হচ্ছেন- ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল। তিনিও ফতওয়ার ব্যাপারে একই মত পোষণ করতেন। এমনকি মতামতের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আরো বেশি কঠিন ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কোনো ব্যাপারে সবাই একমত হলে তবেই সেগুলো লিখো; একমত না হলে লিখো না। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর চেয়েও আরো কঠোর ছিলেন। তিনি বলতেন "আমার কোনো মতামতহই লিখো না। যদি আমার মতামত যাচাই করতে চাও অথবা ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকের মতামত যাচাই

বাছাই করতে চাও তাহলে সেগুলো উৎস সম্পর্কে খোঁজ নাও। আর যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লোহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।"

এ কারণেই আমি বলছি, আমি একজন পাক্কা হাম্বলি। হাম্বলি মানে তো যারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে অনুসরণ করে চলে। আমি ইমাম হাম্বলকে অনুসরণ করি কারণ তিনি বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। আমি পুরো ১০০% হাম্বলি। অন্যান্য হাম্বলিরা হয়তো ৭০% বা ৮০% হাম্বলি, তবে ১০০% নয়; কিন্তু আমি একজন পাক্কা হাম্বলি।

তাহলে যদি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে শান্তিতে রাখুন) যা বলেছেন সেগুলো মানলে সে হানাফী; তাহলে আমি পাক্কা হানাফী, ১০০% হানাফী। যদি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) যা বলেছেন সেগুলো মানলে সে শাফেয়ী; তাহলে আমি পাক্কা শাফেয়ী, ১০০% শাফেয়ী। যদি ইমাম মালিক (র)-কে অনুসরণ করলে মালিকী হওয়া যায় তাহলে আমি পাক্কা মালিকী, ১০০% মালিকী। আর যদি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে অনুসরণ করলে হাম্বলি হওয়া যায় তাহলে আমি পাক্কা হাম্বলি, ১০০% হাম্বলি।

কারণ, এই চারজন ইমামই বলেছেন, "্যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।"

মাযহাব কী?

দেখুন, এই চারজন ইমামের অনুসারী এবং এই মাযহাবগুলো আসলে কী? মাযহাব শব্দের অর্থ কী? মাযহাব শব্দের অর্থ হচ্ছে- পথ অথবা যাওয়ার রাস্তা। মাযহাবের আর একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে- 'সুন্নাহ'। সুন্নাহ শব্দের অর্থ 'পথ'। নবীজীর সুন্নাহ মানে নবীজীর দেখানো পথ।

তাহলে এই চারজন ইমামের মাযহাব ছিলো আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর মাযহাব। চারজন ইমামই বলেছেন, যদি কোনো সহীহ হাদীস পাও তাহলে আমার ফতওয়া বাদ দাও। তাহলে দেখা যাচ্ছে- উক্ত চারজন ইমামের মাযহাব ছিলো আমাদের রাসূলে (সাঃ)-এর মাযহাব।

ইমাম আবু হানিফা (র) আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি নতুন করে হানাফী মাযহাব নামে কোনো কিছু চালু করেন নি। ইমাম মালেক (র) মালিকী মাযহাব নামে নতুন করে কোনো কিছু চালু করেন নি। তেমনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হাম্বলি মাযহাব নামে নতুন করে কোনো কিছু চালু করেন নি। তারা সবাই বলেছেন, যদি কোনো সহীহ হাদীস পাও তাহলে আমার ফতওয়া বাদ দাও।

অর্থাৎ এই চারজন ইমামের মাযহাবই ছিলো আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর মাযহাব। তারা সবাই রাসূলের মাযহাব অনুসরণ করেছেন।

খ্রিস্টানদের মধ্যেই এরকম একটি ভুল ধারণা চালু আছে। যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেননি; তিনি এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে। একইভাবে এই চারজন ইমামই এসেছিলেন আমাদের জ্ঞান দিতে; আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে। তারা নবীজী (সাঃ)-এর মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবে ছিলেন না।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, (সুূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-৫৯)-এ উল্লেখ করা হয়েছে-
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾
অর্থঃ "আনলাহকে মানো এবং তার রাসূলকে মানো এবং যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী এবং জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে!.......... "

তবে আয়াতটি এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। এরপর বলা হয়েছে-
অর্থ: যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে তাহলে আলাহ ও তার রাসুলের কাছে ফিরে যাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।
তাহলে যাদের জ্ঞান আছে ইমান আবু হানিফা,ইমাম শাফেয়ি,ইমাম মালেকি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের শান্তিতে রাখুন) প্রমুখ জ্ঞানীদের মতভেদ থাকলে আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে ফিরে যাবেন। আর এ ব্যাপারে চারজন ইমাম একই কথা বলেছেন, "যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আলাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও/'
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে (সূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-৫৯)-এ একই কথা বলেছেন
কোনো রকম মতভেদ থাকলে আমরা কী করবো? আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে ফিরে যাবো। ব্যাপারটা খুবই সহজ। তবে কিছু মুসলিম আছে, যারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারে- "ভাই জাকির! আপনি বললেন, ভালো। যেসব লোকের কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আছে তাদের

জন্য এটা জানা সহজ যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। কোনটা সহীহ হাদীস আর কোনটা যয়ীফ হাদীস। কিন্তু সাধারণ মুসলিমরা বুঝতে পারে না যে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। তাহলে তাদের উপায় কী? প্রশ্নটা খুবই সুন্দর।

তারা বলে এজন্য আমরা তাকলীদ করি তথা অন্য কাউকে অনুসরণ করি।

তাকলিদের স্বরুপ

আমি তাদের তখন বলি তাকলীদ মানে কী? দেখুন, কোনো ইমামের অনুসরণ করলে তাকে তাকলীদ বলা হয় না বরং সেটাকে বলে মুকান্লিদ। যদি দেখেন আপনার ইমাম ভুল করেছেন তারপর সেটা শুধরে দিলেন; তখনও আপনি মুকাল্লিদ থাকবেন।

যেমন ধরুন, আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা আছে, এজন্য ডাক্তার লাগবে। এমতাবস্থায় আপনি কার কাছে যাবেন? আপনিতো আর যার তার কাছে যাবেন না; যাবেন একজন হার্ট স্পেশালিস্ট-এর কাছে। আপনি ভেবে দেখবেন, এমবিবিএস? না, এমডি'র কাছে? সে কীসের উপর এমডি ব্রেনের উপর? না, সেকি হার্টের উপর এমডি? যদি হা হয় তাহলে তার কাছে যাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা কারণে আপনি যার তার কাছে যাবেন না; যাবেন একজন ডাক্তারের কাছে। এই ডাক্তার আবার যেকোনো একজন ডাক্তার নয়; সে হার্ট স্পেশালিস্ট। একজন হার্ট বিশেষজ্ঞের নিকটে গেলে তবেই আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ আপনি নির্ধারিত সমস্যার সমাধানে এঁ বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তার কাছেই যাবেন; অন্য কারো কাছে যাবেন না। আপনি আগে রিসার্চ করে তারপর ডাক্তারের কাছে যাবেন। যে কোনো একজন ডাক্তারের কাছে যাবেন না। রাস্তায় যদি একজন লোক বলে যে, আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা? তাহলে এই কাজ করুন।
এমতাবস্থায় আপনি কি তার কথা শুনবেন? না, শুনবেন না। কারণ, তিনি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন।

একইভাবে তৃতীয় ক্যাটাগরি; অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলকে মানো। এরপর হচ্ছে- তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী।

আপনি রিসার্চ করবেন। একজন বিশেষজ্ঞ একটি মত দিলে সেটা সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে; আপনি সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে পারবেন না।

ধরুন, দশজন বিশেষজ্ঞর মত শুনলেন। আপনি বললেন যে, প্রথম বিশেষজ্ঞ প্রায় ৩০/৪০টি রেফারেল দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি ২০টি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি। ২০টিই কুরআন এবং সহীহ হাদীসের রেফারেল। তাহলে ২১ নম্বরটা আর যাচাই-বাছাই করতে হবে না।

তারপর দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞকে দেখলেন। যাচাই-বাছাই করে দেখলেন তার টার কিছু সহীহ হাদীস আর কিছু যয়ীফ হাদীস। তৃতীয় বিশেষজ্ঞর বলা অধিকাংশ কথাই ভিত্তিহীন। কোনো যাহ হায় নেই ত বন কে ইও বেশি সহীহ হাদীস আছে সেখানকার একটির সাথেও মিলে না।

তাহলে অনেক বিশেষজ্ঞই আছেন, কিন্তু আপনি যাচাই-বাছাই করে দেখবেন। আপনি দেখলেন, প্রথম বিশেষজ্ঞ সঠিক কথা বলেন। তার কথাগুলো কুরআনহাদীসের রেফারেস ছাড়া বলেন না। আর তার কথাগুলো যাচাই-বাছাই করেও সঠিক পেয়েছেন।
তারপর আপনি তাদের কোনো প্রশ্ন করলেন আর তিনজন বিশেষজ্ঞই মতামত দিলেন। আপনি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানবেন প্রথম জনের কথা। কারণ আপনি আগে তিনজনকেই যাচাই-বাছাই করে দেখেছেন এবং প্রথম জনের ২০টি রেফারেনস আপনি যাচাই করে দেখেছেন যে, তা কুরআন এবং সহীহ হাদীসে রয়েছে। তাহলে তার ২১ নং রেফারেলটাও সঠিক হবে। প্রত্যেক মুসলিম বিশেষজ্ঞের দেওয়া মতামতের সবগুলো যাচাই করতে পারবেন না। আপনি এখানে আগে রিসার্চ করে দেখবেন, প্রথম বিশেষজ্ঞকেই মানা উচিত। কারণ, তিনি সব বিষয়ে কুরআন হাদীস নিয়েই কথা বলেন।
মনে করুন চারজন বিশেষজ্ঞ। তাদের প্রথমজনের সবগুলোই সঠিক পেলেন। দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞের কিছু সঠিক আর কিছু ভুল এবং তৃতীয় বিশেষজ্ঞের অধিকাংশই ভুল। তাহলে আপনি রিসার্চ করে বুঝার চেষ্টা করবেন যে, কেমন বিশেষজ্ঞ। অতপর পরবর্তী সমস্যাগুলোর জন্য রিসার্চ না করে প্রথম বিশেষজ্ঞকে মেনে চলেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তবে, ধরুন আপনি একজন বিশেষজ্ঞের কথা মানেন; তার উপর রিসার্চ করেছেন। অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বললেন প্রথমজন যা বলেছেন তা ভুল, আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি কুরআন এবং হাদীস দিয়ে; তাহলে প্রমাণটা যাচাই করুন। যদি প্রমাণটা ভুল হয় তাহলে প্রথমজনকেই মেনে চলুন। কিন্তু যদি দেখেন যে, প্রমাণটা কুরআন এবং সহীহ হাদীসে রয়েছে। তাহলে প্রথমটা বাতিল করে দ্বিতীয়টাই মেনে চলুন।

এখানে আরো একটা উদাহরণ দেই। যেমন-ধরুন আমি। আমি যেটা বলি সেটা বক্তব্যের আগে যাচাই-বাছাই করি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে অনেক তথ্য আছে যেগুলো সবই যাচাই-বাছাই করা হয়নি। তারপরও ভাগভাগ করি। যেমন ধরুন, যদি আমি শেখ নাসির উদ্দীন আলবানির কোনো মতামত শুনি (তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছে। আমার মতে তিনি বর্তমান সময়ের সেরা মুহাদ্দিস ছিলেন।) তাহলে আমি তা অনুসরণ করি। কারণ আমি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি যে, তিনি মাশাআল্লাহ কুরআন হাদীস অনুযায়ী কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি ফতওয়া দেন

নাসির উদ্দীন আলবানির কথাটাকে আমি বাতিল করে দেবো। আমি এটা করতে পারি, কারণ আমি জানি সব মানুষই ভুল করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন, ইমাম শাফেয়ী (র) ভুল করেছেন, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বলি (র)-ও ভুল করেছেন। সুতরাং নাসির উদ্দান আলবানি (র)-ও ভুল করতে পারেন। তবে তিনি এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি কুরআন-হাদীস অনুযায়ীই কথা বলেন।

কিন্তু যদি এখানকার একজন সাধারণ লোক আর নাসির উদ্দীন আলবানির কথার মধ্যে মতপার্থক্য হয় তাহলে আমি নাসির উদ্দীন আলবানির কথাই অনুসরণ করবো। তবে বক্তব্যে কিছু বললে আমি সেটা যাচাই-বাছাই করি। কারণ বক্তব্যে যেটা বলি সেটা আমার দায়িতব। কিন্তু আমি যদি কোনো মতামত দিতে চাই, আমার পক্ষে সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা সম্ভব নয়, কঠিন। সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন। তাই দেখতে হবে কোন বিশেষজ্ঞের কথাশুনছেন অথবা কোন লেখকের বই আপনি পড়ছেন বা কোন বক্তার বক্তব্য আপনি শ্রবণ করছেন।

আপনি ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করুন যে, এই বিশেষজ্ঞের কথা ২০% ভুল, এই বিশেষজ্ঞের কথা ৫০% ভুল, আর এই বিশেষজ্ঞের কথা ৭০% ভুল। তারপর যদি আপনার হাতে সময় না থাকে আর প্রথম বিশেষজ্ঞের উপর আপনার ভরসা থাকে তাহলে সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে হবে না। যদি হাতে সময় থাকে তাহলে যাচাই-বাছাই করেন তাহলে সেটা তাকলিদ নয়; বরং আপনি যদি আপনার ইমামের কোনো মতামত কেউ ভুল প্রমাণ করা সত্বেও আপনি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন তাহলে সেটাই তাকলিদ। আমরা তাকলিদ করবো একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলের উদ্দেশ্যে; আর কারো না। 0494৮৮ 4৮ ব্যাস, খুব সহজ।

এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন ভাই জাকির, আপনি বলছেন আপনি কোনো দলাদলি করবেন না; কিন্তু রাসূল (সাঃ) তো বলে গেছেন "আমার উন্মতের মধ্যে ৭৩টা আলাদা দল হবে/" আমি বলবো হ্যাঁ, নবীজী বলেছেন এমনটি হবে; কিন্তু তিনি বলেননি এটা করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের দলাদলি করতে নিষেধ করেছেন; তবুও মুসলিমের মাঝে দলাদলি হবে আর এটা নবীজী (সাঃ) জানতেন। তাই তিনি এটা বলেছেন; তিনি বলেননি যে, এটা করা উচিত। যদি আপনারা সহীহ হাদীস পড়েন তাহলে দেখবেন আবু দাউদের ৪৫৭৯ এবং ৪৫৮০ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- নবী করিম (সাঃ) বলেছেন "ইহুদীরা ৭১ বা ৭২টা দলে বিভক্ত, খিঁস্টানরা ৬৯ বা ৭০টা দলে বিভক্ত। আর মুসলিমরা ৭৩টা দলে বিভক্ত হবে।'

এরপর সহীহ তিরমিযষীতে এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে। তিরমিযীর ১৩১ ও ২৬৪৩ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- আমাদের নবীজী মুহাম্মদ সাঃ) বলেছেন, "বনী ইসরাইল (ইহুদী বা খিিস্টানরা) ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছে। তবে আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। একটা দল ব্যতীত অন্য সবাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণপ্রীমূ করলেন, ইয়া রাসুলুলাহ (সাঃ) সেই দলে কারা? নবীজী বললেন, যারা আমাকে এবং আমার সহচরদের অনুসরণ করবে।'

নবীজী (সাঃ) বলেছেন- ৭৩টি দল হবে আর ১টা দল বাদে সবাই দোযখে যাবে। এবং নাজাতপ্রাপ্ত দলে তারাই থাকবে, যারা নবীজী এবং তার সাহাবীগণকে অনুসরণ করবে।

আর একটা হাদীস আছে সহীহ বুখারীতে। সহীহ বুখারীর ৩ নং খণ্ডের ২৬৫২ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে সেরা মানুষ হলো যারা আমার সময়টাতে ছিলো। অথাৎ সাহাবীগণ। এরপরে পরবর্তী প্রজন্ম আর তার পরে তার পরের প্রীজন্য।"

অর্থাৎ নবীজী বলেছেন, সবচেয়ে সেরা মানুষ সাহাবীগণ তারপর তাবেয়ীগণ এরপর তাবে-তাবেয়ীগণ। এরপরের কথা আর বলেননি।
তাহলে আমরা যদি কিছু গ্রহণ করি সেটা গ্রহণ করবো নবীজীর প্রজন্ম থেকে অর্থাৎ সাহাবীগণ, এরপর তাবেয়ীগণ এরপর তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে। এই তিন প্রজন্মকে থেকে গ্রহণ করবো। তাঁদেরকে বলা হয় সালফে-সালেহীন; অর্থাৎ, ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বপুরুষ অথবা ন্যায়নিষ্ঠ পূর্ববর্তীগণ। সালাফ অর্থ পূর্বপুরুষ বা পূর্ববর্তী।

তাহলে ইসলামী শরিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি মোট চারটা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কুরআন' আল্লাহ তায়ালার কালাম। যদি কোনো কিছু পবিত্র কুরআনে খুঁজে না পান তাহলে পরের উৎসে চলে যাবেন। আর পবিত্র কুরআনের পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ‘সহীহ হাদীস'। হাদীসগুলোর মধ্যে নবীজী (সাঃ) যে নির্দেশগুলো দিয়েছেন সেগুলোর গুরুত্ব তিনি যা করেছেন সেগুলোর চেয়ে বেশি। যদি নবীজীর কথা আর কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে সেখানে কথার গুরুত্ব বেশি। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে- সাহাবীগণ। তিনটি প্রজন্ম তথা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের ইজমা। সাহাবীগণের মধ্যে একজনের কথার চেয়ে কয়েকজনের কথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারপর তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীন। আর চতুর্থ উৎস বা শেষ উৎস হচ্ছে- ‘কিয়াস'। যদি উপরোক্ত ৩টি উৎসে কোনো সমাধান না পান; অর্থাৎ কুরআনে পেলেন না, হাদীসে পেলেন না, তিনটা প্রজন্মের জীবন কাহিনীতেও সেটা পেলেন না; তখন ব্যবহার করবেন ‘কিয়াস'। কিয়াস হচ্ছে- সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা।

ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি

তাহলে শরীয়তে চারটা জিনিস আছে। ১. পবিত্র কুরআন। ২. সহীহ হাদীস; কোনো সহীহ হাদীস কুরআনের বিরুদ্ধে যাবে না। এই হাদীসগুলোর মধ্যে কাজের চেয়ে কথার গুরুত্ব বেশি। নবীজীর নির্দেশের গুরুত্ব তার কাজের চেয়ে বেশি। ৩. তিন প্রজন্মের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবেতাবেয়ীগণ। এখানে একজনের চেয়ে কয়েকজনের গুরুত্ব বেশি। অর্থাৎ ইজমা তারপর হচ্ছে- ৪.কিয়াস।

আমরা এই নিয়মটা মেনে চলবো; কুরআন আর সুন্নাহ। কিন্তু সব দলইতো বলে যে, আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ মেনে চলি; কেউতো বলে না যে আমরা কুরআন এবংসুন্নাহ মানি না।

এখন আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ মেনে চলবো কীভাবে? যেভাবে তিন প্রজন্ম মেনেছিলেন। কারণ নবীজী (সাঃ) বলেছেন, সেরা প্রজন্ম হলো আমার প্রজন্ম, তারপরের প্রজন্ম এবং তারপরের প্রজন্ম। তাই যদি কোনো মতভেদ দেখা দেয় যে, সাহাবীগণ সেটা কীভাবে বুঝেছিলেন। যদি সেখানে না পান তাহলে দেখবেন তার পরের প্রজন্ম তাবেয়ীনগণের মধ্যে। সেখানেও যদি না পান তাহলে দেখবেন তার পরের প্রজন্ম তাবে-তাবেয়ীনগণের মধ্যে। এভাবে মেনে চলবো।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়তেরই একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন'মাছেহ'। এর দুটো অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে শারীরিক স্পর্শ এবং আর একটি অর্থ হতে পারে সহবাস। কিন্তু সহীহ হাদীস দেখলে দেখা যায় যে, এটার অর্থ হবে 'সহবাস করা' শারীরিক স্পর্শ নয়।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে যদি কোনো মতভেদ থাকে তাহলে সেটার আমরা ব্যাখ্যা খুঁজবো যে, কুরআনের অন্য কোনো আয়াতে বিষয়টি কীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি সেখানে কোন ইশারা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহলে সে আলোকে ব্যাখ্যা করব। যদি না থাকে তাহলে আমরা সহীহ হাদীসগুলো খুঁজে দেখবো যে, সেখানে বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি সেখানেও না পাওয়া যায় তাহলে দৃষ্টান্ত দেখতে হবে প্রথমে সাহাবীগণের তারপর তাবেয়ীনগণের এরপর তাবে-তাবেয়ীনগণের কার্যাবলীতে।

তাহলে কুরআন বুঝার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে কুরআন তারপর সহীহ হাদীস এরপর সালফে-সালেহীনদের কাজ। আমরা এভাবেই মেনে চলবো।

এছাড়া পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। যেমন- পবিত্র কুরআনের (সুরা-বাক্বারা, অধ্যায়-২, আয়াত-১৫৪)-তে আছে -

অর্থঃ "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত্যু বলো না; বরং তারা জীবিত/"

এখানে অনেকে বলতে পারেন, তাহলে তারা তো বেচে আছেন। তাদের সাথে কথা বলতে পারবো। এখন যদি এই শহীদগণ জীবিত হন তাহলে তো আমাদের নবীজীও বেঁচে আছেন। খুব সুন্দর যুক্তি। কিন্তু সাহাবীগণ এটাকে কীভাবে বুঝেছিলেন? তারা কি ধরে নিয়েছিলে যে, নবীজী বেঁচে আছেন? তারা তো নবীজী (সাঃ)-এর জানাযার নামায পড়েছেন, তাকে কবরস্থ করেছেন। এছাড়া সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে সাথীদেরকে কবর দিয়েছেন, তাদের জানাযা পড়েছেন। জীবিত কারো জানাযা নামায কি পড়া যায়? উত্তর হবে- না, জীবিত কারো জানাযা নামাম পড়া যায় না।

এখানে কুরআনের আয়াত বলছে- শত্রুরা যখন উল্লাস করে বলে, 'তোমাদের লোকদের মেরেছি: তবে তাদের সাথে পরকালে দেখা হবে। আর তারাই হবেন লাভবান।

এখানে শারীরিকভাবে বেচে থাকার কথা বলা হচ্ছে না। যদি শারীরিকভাবে জীবিত থাকবেন তাহলে সাহাবীগণ তাদের কবর দেবেন কেন?

তাহলে কুরআনের কোনো আয়াতের কোনো অর্থ নিয়ে যদি মতভেদ দেখা দেয় তাহলে তার সমাধান খুঁজতে হবে-কুরআনে ও সহীহ হাদীসে অথবা দৃষ্টান্ত দেখতে হবে প্রথমে সাহাবীগণের তারপর তাবেয়ীনগণের এরপর তাবে-তাবেয়ীনগণের কর্মকান্ডে। ব্যাপারটা খুবই সহজ, কোনো কঠিন কাজ নয়। শুধুমাত্র একটু রিসার্চ করতে হবে।

এখন আরেক দল লোকের কথা বলবো। এমন কিছু লোক আছে- যাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনি কোন দলের? আপনার পরিচয় কী? তারা বলে আমরা 'আহলে হাদীস'।আমি বলি, আহলে হাদীসের অর্থটা কী? তারা বলে আমরা হাদীসের অনুসারী; কুরআন এবং হাদীসের অনুসারী। আমি বলি, ভালো; কথায় যুক্তি আছে। আমি তাদের বলি, আপনি আপনাকে আহলে হাদীস বলছেন, আর আমি আমাকে বলি আহলে সহীহ হাদীস। কারণ, আমি মানি শুধু কুরআন আর সহীহ হাদীস। অনেক মুসলিম আছে যারা মানে যয়ীফ আর মাওযু হাদীস। এজন্য যদি কেউ এমন নামে ডাকতে চায় তাহলে আমি আমাকে আহলে সহীহ হাদীস নামে অভিহিত করবো।

দেখুন, অনেক হাদীস আছে যেগুলো যয়ীফ হাদীস আর মাওযু হাদীস। যেমন, নাভীর নীচে হাত বাধাসহ এরকম আরো কিছু মাসায়েল সম্পর্কীত হাদীস। আমি শুধু সহীহ হাদীসগুলোই মেনে চলি। এই লোকগুলোকে আমি আরো বলি- ভাই, আপনার আহলে হাদীস মানে কুরআন আর হাদীস পুরোপুরিভাবে মেনে চলেন। খুব ভালো কথা। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে ডাকো? তারা এ কথার কোনো উত্তর দেয় না। আবার বলি, এমন কোন সহীহ হাদীসে আছে, যেখানে নবীজী বলেছেন নিজেদের আহলে হাদীস বলে ডাকো? উত্তর নেই।

এসব কারণে আমি নিজেকে আহলে হাদীস বলে ডাকি না; বরং আমি মুসলিম আর পাক্কা আহলে হাদীস। আপনারা হলেন আংশিক আহলে হাদীস তথা ৯০% বা ৯৫% আহলে হাদীস; আর আমি পুরোপুরি আহলে হাদীস, আহলে সহীহ হাদীস। আপনারা যদি কুরআন এবং হাদীস মেনে চলেন তাহলে একথাতো ঠিক যে, কুরআনের কোনো আয়াত বলছে না যে, নিজেকে আহলে হাদীস বলে ডাকো; অথবা কোনো সহীহ হাদীসেও নেই যেখানে কবীজী (সা:) বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে ডাকো।

এছাড়াও আরো একটা গ্রুপ আছে আহলে হাদীসের মতো। যারা বলে আমরা সালাফী। আমি বলি সালাফী' মানে কী? তারা বলে, আমরা মানি 'সালফেসালেহীনকে'। আমি বলি, আমিওতো

'সালফে-সালেহীনকে' মানি। আমি মানি, কুরআন, হাদীস ও সালফে-সালেহীনকে। নবীজীর প্রজন্ম এবং তার পরবর্তী দুটো প্রন্মকে। তারপর তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, কুরআনের কোনো আয়াতে কী একথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদেরকে সালাফী বলে উল্লেখ করো? তারা বলে, না।
আবার বলি, কোনো সহীহ হাদীসে কি উল্লেখ আছে যেখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেনতোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে উল্লেখ করো? তারা বলে, না, নেই।

তবে, কিছুদিন আগে একজন সালাফী আমাকে একটি হাদীস দেখালো যেখানে নবীজী বলেছেন, 'আমি একজন সালাফ'। সে এটি সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বললো; কিন্তু পুরো রেফারেসটি সে বলেনি। আমি বললাম, ঠিক আছে। এরপর আমি সহীহ মুসলিম খুলে দেখলাম যে, হাদীসটি আছে সহীহ মুসলিমের ২ হাজার ৪০৬ নম্বরে। হাদীসটি সহীহ হাদীস নি:সন্দেহে; এই শব্দটি মাঝখান থেকে নেওয়া। পুরো হাদীসটি বলছে-

"মুহাম্মদ (সাঃ) (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি একজন উৎকৃষ্ট সালাফ তোমার জন্য

আমি তোমার জন্য একজন উৎকৃষ্ট সালাফ কথাটি বাবা বলছেন তার মেয়েকে। অর্থাৎ ফাতিমা (রাঃ)- কে বলেছেন তাঁর বাবা নবীজী (সাঃ) যে, তোমার জন্য আমি একজন উৎকৃষ্ট সালাফ। আরবি ভাষায় সালাফ মানে পূর্বপুরুষ বা পূর্বসূরী'।
তাহলে আমি যদি আমার মেয়েকে বলি যে, আমি তোমার 'সালাফ' তাহলে কোনো সমস্যা নেই; কারণও নেই। একজন আরব খ্রিস্টান যদি বলে আমি তোমার 'সালাফ' তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থগত দিক থেকে এরকম ভাবা বা মনে করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই; কারণও নেই।

তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সালাফ শব্দটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। আমাদের নবীজী (সাঃ) অবশ্যই তার কন্যার জন্য উৎকৃষ্ট সালাফ ছিলেন; কিন্ত আমরা সকল বাবা-ই তার কন্যার জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উৎকৃষ্টমানের সালাফ নেই। এমন হতে পারে যে, হয়তো সেই সন্তান তার বাবার চেয়ে আরো বেশি ইসলামিক।

তাহলে প্রত্যেক বাবা-মা-ই তার সন্তানকে এ কথাটি বলতে পারে না যে, সে সন্তানের জন্য উৎকৃষ্টমানের সালাফ। সালাফের যদি শব্দগত অর্থ নেন, তাহলে বিশেষজ্ঞদের মতে

(সালাফীদের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন) “বর্তমানে কেউ বলতে পারে না যে, সে একজন সালাফ।” কেন? কারণ আমরা খারাপ, আমরা পরে এসেছি। সালাফীগণ ছিলেন আমাদের আগে। তাহলে আগের মানুষদের সাথে তুলনা করলে আমরা খারাপ।

তবে হ্যাঁ, আমরা আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, বংশধরদের জন্য সালাফ হতে পারি, আর সেটা শব্দগতভাবে; ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সালাফী নই বরং আমরা খারাপ।

সেখানে প্রথম যাওয়া। সেখানে যারা ডেকেছিলেন তারাও ছিলেন কুরআন সুন্নাহর অনুসারী। আমি যথা সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছলাম এবং যে শহরে যাওয়ার কথা সেখানে গেলাম। রাতের বেলা আমি আমার সাথে যাওয়া অন্যান্যদের নিয়ে পৌঁছলাম এবং সবাই মিলে সেখানে নামায আদায় করলাম। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে শব্দ করে বললেন, “আরে আপনারাতো আমাদের মতো করেই নামায পড়েন।” আমি বললাম, আপনাদের মতো করে মানে? আমি তো নবীজীর মতো করে নামায পড়ি। আমরা আপনাদের মতো করে নামায পড়তে যাবো কেন? আমরা নামায পড়ি নবীজী (সাঃ)-এর মতো। এ গ্রুপের লোকজনও মাশাআল্লাহ। কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলেন। হবে তাদের বলা উচিত ছিলোমাশাআল্লাহ, আপনারা নবীজী (সাঃ)- এর মতো করে নামায পড়েন;

আমাদের মতো করে নয়। কারণ আমি তো তাদের দেখে নামায পড়ছি না বরং আমি আগে থেকেই নামায পড়ছি। আর আমি তাদের মতো করে নামার পড়ছি না; নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ছি। আর মাশাআল্লাহ, তারাও নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ছে। তার বলা উচিত ছিলো- মাশাআল্লাহ, আপনারা নবীজী (সাঃ)এর মতো করে নামায পড়েছেন আর আমরাও নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ি। সে তা না বলে বললো, আরে আপনারাতো আমাদের মতো করে নামায পড়েন।

খুব খুশি।

তারা আগে আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো দেখেছিলো এবং এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, “ডা. জাকির ধর্ম সম্পর্কিত যে কথাগুলো বলেছিলো সেগুলো সঠিক।” কিন্তু তারা আমার আক্বিদা সম্পর্কে জানতো না যে, আমার ধর্ম বিশ্বাস কেমন। আর সে কারণেই তারা খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। তারা দেখেছে যে, আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন স্পেশালিস্ট; কিন্তু তারা আমার ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জানে না। তারপরও তারা আমাকে আমন্ত্রণ করলো আর নামায দেখে তার খুব খুশি হলো যে, হ্যাঁ, আপনারাতো আমাদের মতো করেই নামায পড়েন।

তবে তারা সকলেই খুব ভালো, মাশাআল্লাহ। তারপর আমি সেখানে কিছু বক্তব্য রাখলাম। অতপর যখন আমরা সকলে মিলে ডিনার খেতে বসলাম।
তখন আমি তাদেরকে আজকের মতো করেই বললাম, আমি পাক্কা হানাফী, পাক্কা শাফেয়ী, পাক্কা মালিকী, পাক্কা হাম্বলী। এরমধ্যে সালাফী প্রসঙ্গ আসলে আমি বললাম, আমি পাক্কা সালাফী। হবে কুরআনে কোথায়ও নেই যে, তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে ডাকো অথবা কোনো সহীহ হাদীসেও নেই যেখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেন- তোমরা তোমাদেরকে সালাফী নামে আখ্যা দাও।

সেখানকার সকলেই আমার সাথে একমত পোষণ করলেন, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত। অন্য সকলেই বললেন, জাকির ভাই, আপনি যা বলেছেন তার সাথে আমরা একমত। একজন মাত্র আমাকে প্রশ্ন করলো- ভাই জাকির, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির নাম শুনেছেন? আমি বললাম- হাঁ, আমি তাকে চিনি। তিনি বললেন- তাকে কেমন মনে হয়? আমি বললাম- মাশাআল্লাহ, আমি তাকে ভালো করে জানি এবং তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের একজন। (মাত্র কয়েক বছর আগের কথা, যখন শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি জীবিত ছিলেন।) তিনি আমাকে বললেন- আচ্ছা, তার কথা মানেন? আমি বললাম- হাঁ, তিনি বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভালোবাসি। তিনি বললেন, আমি আলবানির কথা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। একথা বলে তিনি albani.com।। -এ গিয়ে তার ফতওয়া downloedকরে বললেন, এই ফতওয়ার উত্তর দিন।

আলহামদুলিল্লাহ, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি (র) (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন) একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভালোবাসি। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে দুটো গ্রুপ আছে। এক গ্রুপ বলেন- 'সালাফী বলে পরিচয় দেওয়া ফরয'। শেখ আলবানি (র) হচ্ছেন- এই দলে তথা সালাফী বলে পরিচয় দেওয়া ফরয বলে বিশ্বাসীদের দলে। আমি তার ফতওয়ার উদ্ধৃতি দেখে বললামআলহামদুলিল্লাহ, কেউ যদি কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি আজকে প্রমাণ পেলে সেটা আজ থেকেই পালন করা শুরু করবো। তবে আমি সেটা যাচাই-বাছাই করে দেখবো।

আমি আমার ধর্মের লেবেল হিসেবে নিজেকে বলতে চাই 'একজন মুসলিম'।

যখন আমি শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির ফতওয়াটা পড়লাম (তিনি তার সময়ের একজন সেরা বিশেষজ্ঞ) সেখানে দেখলাম, তিনি লিখেছেন- "ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন-

হাদীসে আছে- ইসলামে ৭৩টি দল হবে এবং তার মধ্যে একটা দল মাএ নাজাত পাবে। আর সেই দলটা হচ্ছে- 'জামাহ'। এই জামাহ অর্থ হচ্ছে- সালাফেসালেহীন তথা প্রথম তিন প্রজন্ম।" হাদীসটা আছে- সহীহ বুখারীতে

হাঁ, আমি সেটা মানি। আমিও প্রথম তিন প্রজন্মকে অনুসরণ করি।

তিনি ইমাম আবু হানিফার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন- জামাহ অর্থ অনুসরণ করা; সাহাবীগণ এবং তৎপরবতী দুই প্রজন্মকে যারা সালাফে-সালেহীন।

আমিও প্রথম তিন প্রজন্মকে অনুসরণ করি।

সে আমাকে আরো দেখালো ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি যে, "তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক সালাফে-সালেহীনকে অনুসরণ করা।" আমি বললাম- হাঁ আমি তো এটি মানি।
তারপর সে আমাকে আরো উদ্ধৃতি দেখালো ইমাম শাফেয়ীর। সেটা হচ্ছে- “এটা বাধ্যতামূলক, তোমরা মেনে চলবে তিন প্রজন্মকে; ধার্মিক পুরুষদের।" আমি বললামহাঁ আমি এটাও মানি; সমস্যাটা কোথায়? তারা কি কোথায়ও বলেছেন তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে ডাকো? আবু হানিফা একথা বলেননি, ইমাম শাফেয়ীও কখনও বলেননি, শেখ ইবনে তাইমিয়াও বলেননি। লোকে মনে করে তারা এটি বলেছেন; আসলে বলেননি।

তাহলে কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে, নিজেদেরকে বলতে হবে 'সালাফী'। এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো একটা কিয়াস; শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির দেওয়া যুক্তি।

শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে একজন তার্কিক প্রশ্ন করেছিলো, (ইন্টারনেটে albani.০০।-এ গেলে দেখতে পাবেন) তিনি সেখানে যুক্তি দিয়েছেন- কেনো আমারা নিজেদেরকে সালাফে-সালেহীন বলবো। একজন প্রশ্নকারীর সাথে সেখানে তার আলোচনা রয়েছে। প্রশ্নকারী এক জায়গায় বলেছেন, আমি একজন মুসলিম। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি প্রশ্ন করেছেন- আপনি কোন ধরনের মুসলিম? আপনি কি খারেজী? আপনি কি মুতাযেলী? আপনি কি শিয়া? আপনি কি রাফেযী? নাকি একজন কাদরী? কোন ধরনের মুসলিম? প্রশ্নবকারী বললো- “আমি কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলা একজন মুসলিম।' শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি প্রশ্ন করলেন- কোন সুন্নাহ?কুরআন সুন্নাহ তো খারেজি রা মেনে চলে। শিয়ারাও মেনে চলে

চলে, আবার কাদরীরাও কুরআন-সুন্নাহ মানে। আপনি কোন ধরনের কুরআন-সুন্নাহর কথা বলছেন? প্রশ্নবকারী বললো- আমি সেই কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলি যেভাবে সালাফেসালেহীন ব্যাখ্যা করেছেন। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তখন বললে- হ্যাঁ, আমরা কুরআন-সুন্নাহ মানবো যেভাবে সালাফে-সালেহীন ব্যাখ্যা করেছেন। তাহলে এই বড় বাক্যটাকেই ছোট করে বললে হয় 'সালাফী' । এটা বলে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তর্কে জিতলেন।

শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি, তাকে ভালোবাসি। আমার অনেক বক্তব্যে তার বেফারেল দিয়েছি। তাকে আমি সম্মান করি। তবে তাকলীদ নয়। তাকলীদ শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং রাসূলের জন্য। হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি, এটা একটা কিয়াস।

আমি এখন বলবো, কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রমাণ করে দেখান; কোনো যুক্তি নয়। আমি চাই সরাসরি রেফারেল কুরআন এবং হাদীসের। কোনো যুক্তি চাচ্ছি না। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যথেষ্ট যুক্তিবুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন। আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই; আমি নিজেকে মনে করি একজন ছাত্র, তালবে ইলম। তবে আল্লাহর রহমতে অনেক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, ইন্ডিয়ার বড় বড় বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করেছি; তাদের কেউ এসেছেন নদওয়া থেকে, কেউ এসেছেন দেওবন্দ থেকে। সৌদির বিশেষজ্ঞের সাথে, মিশরের বিশেষজ্ঞের সাথে, ইরানের বিশেষজ্ঞের সাথে এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিশেষজ্ঞের সাথে আমি আলোচনা করেছি। আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তাই আমাদের এই সময়ের বিখ্যাত অনেক বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ; তাদের সংস্পর্শে আসার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপরও আমি একজন ছাত্র মাত্র। খুবই ক্ষুদ্র একজন মানুষ, আমার জ্ঞান খুব সামান্য; তবে যুক্তি পাল্টা যুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে অনেক রহমত করেছেন।

এখন আপনি কোন ধরনের মুসলিম? আপনি কি খারেজী? মুতাযেলী? শিয়া? রাফেযী? নাকি কাদরী? কোন ধরনের মুসলিম? তর্কটা ছিলো এটি নিয়ে, সেই প্রশ্নকারী আর শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির মধ্যে। প্রশ্নকারী বললো- আল্লাহ তার কুরআনে বলেছেন নিজেদের মুসলিম বলে ডাকো। শেখ তখন উত্তর দিয়েছিলেন-ইসলাম ছিলো তখন মাত্র একদল, আর এখন অনেক আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত। আর একারণেই মুসলিমদের জন্য ফরয যে, আমরা নিজেদেরকে পরিচয় দিতে গিয়ে বলবো সালাফী। এটা একটা যুক্তি। তর্ক সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো আর শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তর্কে জিতেছিলেন।

এখন আমি উত্তর দিচ্ছি- আমার সাথে তর্ক করার প্রয়োজন নেই। আপনি কুরআন হাদীস থেকে দেখান তাহলে ডা. জাকির নায়েক সাথে সাথে মেনে নেবে। বিতর্কের আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি এখন তার উত্তর দিচ্ছি(আমি তার কাছে অর্থাৎ শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির কাছে একেবারেই তুচ্ছ, সমুদ্রের মধ্যে একফোটা পানির মতো। প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি তাকে সম্মান করি এবং আমি আগে অনেক লেকচারে তার রেফারেল দিয়েছি।) আমি বলবো, আচ্ছা। আপনারা যদি আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর জীবন কাহিনী দেখেন তাহলে দেখবেন, তিনি কোনো হাদীসেও বলেননি আর কোনো আয়াতও দেখাননি যেখানে আমাদের বলতে বলা হয়েছে যে, নিজেদেরকে সালাফী বলতে হবে। আর সে কারণেই আমি বলবো না।

এখন যুক্তি! আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর সময়েও অনেক ভণ্ডলোক ছিলো, যারা ছিলো মুনাফিক। তারা মুনাফিক ছিলো; সাহাবীগণ তাদের নামটা বদলাননি। এরপরে ছিলো খারেজী। তারা নিজেদেরকে বলতো খারিজী; লোকজনও তাদেরকে খারেজী আখ্যায় আখ্যায়িত করতো; কিন্তু সাহাবীগণ তাদেরকে বলতেন মুসলিম। এখানে সাহাবীগণ কি বলেছেন যে, তাদের নতুন নাম দাও? না, সাহাবীগণ তারপরও তাদের বলেছেন 'মুসলিম'। তারপরে আছে মুতাযিলা। তাদেরকেও সবাই বলতো 'মুসলিম'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে- সেই সময়েও ধর্ম নিয়ে মতভেদ ছিলো: এমন নয় যে, ধর্ম নিয়ে মতভেদ ছিলো না।

এবার মূল আলোচনা প্রসঙ্গে আসি। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন, আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেদেরকে সালাফী বলা উচিত। এখানে আমার প্রশ্ন হলো- কোন সালাফী? আমি প্রশ্ন করবো- সালাফীদের মধ্যেও এখন গ্রুপ আছে। আমি বলবো- আপনি কুতুবী, ছুরুরী নাকি মাদখালী? আরো কয়েকটি গ্রুপের কথা বলতে পারি। (দেখুন আমি এখানে কারো বিরুদ্ধে বলছি না; প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কাউকে ছোট করতে চাচ্ছি না। তবে এখন সালাফীদের মধ্যে অনেক গ্রুপ আছে। আপনি যদি ইংল্যান্ডে যান দেখবেন, অনেকগুলো গ্রুপ আছে; আর সেখানে পত্যেকটা গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে লড়াই করছে আর বলছে অন্য সালাফী গ্রুপগুলো কাফির। নাউযুবিল্লাহ! সময় পেলে এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো) আপনি কোন সালাফীদের গ্রুপে যাবেন? আপনি যে লেবেলটায় বসাবেন সেখানে একটা পর্যায়ে বিভক্তি চলে আসতেই হবে।

যখন শিয়ারা আসলো তখন লোকজন বললো আমরা সুন্নি তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত। তারপর সেখানেও বিভক্তি এসে হলো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। তারপর আসলো সালাফী ও আহলে হাদীস। এগুলোর মধ্যেও গ্রুপ আছে। যখনই আমরা মানুষরা একটা লেবেল বসাবো সেখানে একটা মতভেদ হবেই। এমনকি আমাদের ধর্ম নিয়েও অনেক মতভেদ হবে আর সেটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন। শুধুমাত্র মানুষের দেয়া লেবেলেই মতভেদ হয় না।

আপনি কি মনে করছেন এগুলো আল্লাহ জানতেন না? আল্লাহ অবশ্যই জানতেন যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতভেদ হবে আর একথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। নবীজীও হাদীসে বলেছেন একথা। তবে নবীজী বলেননি যে, নিজেদের পরিচয় দাও 'সালাফী বা আহলে হাদীস' বলে।

যদি বলি আহলে হাদিস, তবে প্রশ্ন আসে কোন আহলে হাদিস ? আমি যেখানে থাকি সেই বোম্বেতে দুটো আহলে হাদিস আছে। ১.জামিয়াত আহলে হাদিস ও ২. কুরবাত আহলে হাদিস । এখন আপনি কোন দলে যেতে চান? (এক আহলে হাদিস আরেক আহলে হাদিসকে দোষারোপ করে । দেখুন এখানে আমি আহলে হাদিসের নামে বদনাম করছি না। এজন্য বলছি ট্রপিক্সটা খুব স্পর্শকাতর। আমি শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে শ্রদ্ধা করি, আহলে হাদিসদের শ্রদ্ধা করি ।আর অন্যান্যরাও আমার সাথে একমত হবেন যে, সালফী আর আহলে হাদিসরা কুরআন হাদিসের সবচেয়ে কাছাকাছি; এটা আমি স্বীকার করবো) আর যদি বলি 'সালাফী' তাহলে প্রশ্ন আসে কোন সালাফী? প্রথমদিকে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির সময়েও হয়তো সালাফীদের মধ্যে গ্রুপ ছিলো আর এখন অনেক গ্রুপ আছে । সালাফীদের মধ্যে রয়েছে - কুতুবী, মাদখালী; এখন আবার বের হয়েছে টু সালাফী ।আমি সালাফীদের একটি দাওয়া অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম । এই ট্রু সালাফীটা আসলে কী? আমরা বোম্বেতে দাওয়ার উপর প্রশিক্ষন দেই; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। সেবার ১৪টি দেশ থেকে ১৯ জন প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন । তাদেরঅনেকেই এসেছিলেন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরতাদের অনেকেই মাশাআন্লাহ, সালাফী। আমরা তাদের সাথে আলোচনা করলাম সেখানে। সালাফী হলো সংক্ষিপ্ত রুপ। অর্থাৎ কুরআন হাদিস সালাফে-সালেহীন যেভাবে মানতেন সেভাবে মানা। এর সংক্ষিপ্ত হচ্ছে 'সালাফী'। সেটাই আমি তাদেরকে প্রশ্ন করলাম -আচ্ছা বলুনতো, সালাফে-সালেহীন আগে নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) আগে ? কে আগে ? তারা বললো -মুহাম্মদ (সাঃ) আগে । আমি তাদেরকে বললাম - তাহলে নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলছেন না কেন ? (ইন্ডিয়াতে একদল

লোক নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলে পরিচয় দেয়। যাদেরকে আমরা মানি না।) এখন আবার প্রশ্ন হলো- কে বড়? মুহাম্মদ (সাঃ) নাকি আল্লাহ ? উত্তর হচ্ছে - আল্লাহ । আর যে আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় 'মুসলিম' ।

আমরা জানি , মুসলিমদের মধ্যেও অনেক দল আছে। আর নতুন কোন নাম দিলে সেটার মধ্যে বিভক্তি এসে যাবে। হানাফী মাযহাবে চারটা গ্রুপ আছে, শাফেয়ী মাযহাবে আছে কাদিম (পুরাতন) আর জাদিদ (নতুন) ।আবার কাশ্মির গেলে দেখবেন সেখানে আহলে হাদিসের অনেক গ্রুপ আছে আর কেরালায় গেলে দেখবেন মুজাহিদী। কেরালায় কেউ নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে না, তারা বলে যে তারা মুজাহিদী; এবং তারা আহলে হাদিস সম্পর্কে জানেই না। আবার সৌদি আরব গেলে সেখানে দেখবেন, তারা আহলে হাদিস শব্দের সাথে পরিচিত নন। তারা সালাফী শব্দের সাথে পরিচিত। তবে সালাফী আর আহলে হাদিস দুটো একই রকম নামটা আলাদা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে - এক এক জায়গায় এক এক নাম। ইন্ডিয়ার আহলে হাদিসগণ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সালাফী নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে, যদি আপনি লেবেল দিতে যান তাহলে সেখানে বিভক্তি আসবেই। সালাফীর চেয়ে মুহাম্মাদী বলা ভালো; আবার মুহাম্মাদীর চেয়ে মুসলিম বলা ভালো। সেজন্য আমি বলতে চাই যে নবী এবং রাসুলগণকে মানবো আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিবো; আর কিছু নয়। শুরুতেও মুসলিম, আর শেষেও মুসলিম। আমি কোন মুসলিম ভাইকে ছোট করছি না। হোক সে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, আহলে হাদিস বা সালাফী। শেখ উতাইবিকে একজন প্রশ্ন করলো (যিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব)আমাদের দেশে অনেকে নিজেদের বলে ইখওয়ানী আর তাবলিগী। এরা কি সত্যের পথে আছে নাকি ভুল পথে আছে? শেখ উতাইবি উত্তর দিলেন- 'কেউ যদি ইসলাম প্রচারের সময় বলে যে, সে ইখওয়ানী, তাবলীগী বা সালাফী; তাহলে সে ভুল পথে আছে । প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মধ্যে সালাফী শব্দটা ছিল না, কিন্তু শেখ উতাইবি সেখানে সালাফী শব্দটা যোগ করলেন । যদি কেউ ইসলাম প্রচারের সময় নিজেকে ইখওয়ানী তাবলীগী বলে তাহলে সে ভুল পথে আছে। আর এই কথাটা কিন্তু আমি বলিনি। ডা. জাকির নায়েক ইসলামের কিছুই নয়, বরং শূন্য।

শেখ উতাইবি মাশাআল্লাহ, বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত; আর আমি তার ফতওয়াটা শুধু মেনে চলছি। যদি কোন সালাফী দোষারোপ করতে চান তাহলে শেখ উতাইবিকে দোষারোপ করতে হবে।

সালাফীদের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখবেন, তারা বলছে- শেখ উতাইবি নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দিতে বলেছেন। কিভাবে? তিনি সালাফে-সালেহীনদের মেনে চলতে বলেছেন। আমি বলবো, এ কথাতো আমিও বলি। শেখ উতাইবিকে প্রশ্ন করলেও তিনি এভাবে ভাবতে সমস্যা মনে করতেন না; শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের সময় একথা বলা যাবে না যে, আমি সালাফী বা তাবলীগী। যদি বলা হয় তাহলে সে ব্যাপারে শেখ উতাইবি বলেছেন যে, সেটা ভুল কাজ।তাহলে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন সালাফী বলা ফরয আর শেখ উতাইবি বলেছেন এটা ভুল। তবে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন, যদি মনে করো সালাফী বলে তুমি সবার শ্রেষ্ঠ ,তাহলে সেটা ভুল। অর্থাৎ এখানে দুজনের কথা প্রায় একই। তাহলে যে বিশেষজ্ঞরা নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দিতে বলেছেন, তারাও মনে করতেন যে, যদি তুমি তোমাকে সালাফী বলে পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি ভাবো যে ,তুমি সালাফী বলে তুমি সবার শ্রেষ্ঠ আর তুমিই একমাত্র বেহেস্তে যাবে ; অন্যরা যেতে পারবে না; তাহলে সেটা ভুল।

শেখ উতাইবি বলেছেন, সালাফী বলে পরিচয় দেয়াটা ভুল। আমি শেখ উতাইবির মতে কঠিন করে বলবো না; তবে যদি বলতে বলেন , তাহলে বলবো- মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়াটাই ভালো। যদি কেউ নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দেয়, কোন ক্ষেত্রে সেটা মুবাহ। আমি বলছি না যে, এটা হারাম। তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে- মুসলিম বলা; আর এটা ১০০% সংরক্ষিত। এটা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন মতভেদ হবে না।

যদি কেউ সংক্ষেপে বলতে চায় এ কথাটাকে যে, আমি মানবো কুরআন হাদিস আর সালফে-সালেহীনদেরকে আর এটা বুঝাতে গিয়ে সালাফী বলে পরিচয় দেয় তাহলে বলবো এটা মুবাহ তবে ফরয নয়। আমি এখানে যে ফতওয়াটা মানবো সেটা হলো শেখ সালেহ মুনাজ্জিদের ফতওয়া। তিনি বলেছেন, আপনি মনে করেন যে,আপনি কুরআন হাদিস না মানা লোকদের দলে নন আর এটা বুঝতে গিয়ে উক্ত পরিচয় দেন তাহলে সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি কেউ বলে, আমি সালাফী বলে শ্রেষ্ঠ তাহলে সেটা ভুল। তিনি এটা বুঝাতে গিয়ে নবীজী (সাঃ) এর একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন নবীজী (সাঃ) যখন মদীনায় ছিলেন সে সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একবার কোন্দল হোল। তখন মুহাজিররাও তাদের সাহায্যের জন্য অনন্য মুহাজিরদের ডাকলেন। নবীজী(সাঃ) তখন বললেন, এই জাহেলিয়াত সম্বোধনটার কারণ কি?

এমনি কিন্তু আনসার শব্দটা খারাপ না আবার মুহাজির শব্দটাও খারাপ নয়। কিন্তু এখানে গুরুত্ব দিয়ে ডাকা হচ্ছে - আনসার আমাকে সাহায্য, মুহাজির আমাকে সাহায্য করো। নবীজী (সাঃ) বলেছেন- এটা জাহিলিয়াত সম্বোধন। আনসার একটা সুন্দর নাম। আনসার হচ্ছেন আমাদের নবীজীর সাহায্যকারী। আর মুহাজির মানে যারা হিজরত করেছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথে। এগুলো সুন্দর নাম; কিন্তু রাসূল(সাঃ) বলেছেন, এটা হারাম, জাহেলিয়াত। এটা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানানোর প্রচেষ্টা। তবে এটার উপর ভিত্তি করে আমি বলছি না যে, সালাফী বলা হারাম। আমাকে ভুল বুঝবেন না। তবে সবচেয়ে ভালো হলো- মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়া। এটা সেফ, এতে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এমনিতে আপনি হতে পারেন ,পাক্কা হানাফী, পাক্কা শাফেয়ী, পাক্কা হাম্বলী,পাক্কা মালেকী,পাক্কা আহলে হাদিস, পাক্কা সালাফী। কোন সমস্যা নেই। কিন্তু পরিচয় দিতে গিয়ে বলবেন- আমি মুসলিম, প্রচার করবেন মুসলিম বলে।

যাতে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। অনেকে তাকলীদের কথা বলেন। তাকলীদ থাকলে তাকে কাফির বলা হচ্ছে। ইমাম শাফেয়ী (র) (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন) বলেছেন, আলাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ডাকবে আল্লাহ যে নামগুলো বলেছেন সেসব নামে; অন্য নামে ডাকা হারাম, কুফরি। আল্লাহকে ডাকবেন যে নামে তার রাসূল ডেকেছেন সে নামে, অন্য নামে নয়। অন্য নামে ডাকা হারাম। কিন্ত যদি কেউ আল্লাহকে অন্য নামে ডাকে ব্যাপারটা না জেনে, তাহলে সে কাফির নয়। ইমাম শাফেয়ী এটা বলেছেন।

শেখ ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, “্যদি কেউ কোনো মানুষকে সিজদা করে আর মনে করে যে, এটাই তার দ্বীন; তাহলে সে অবিশ্বাসী নয় এ পরত যতক্ষণ না তাকে অন্য কোনো লোক তাকে ব্যাখ্যা করে বলে এবং সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” একথা বলেছেন, শেখ ইবনে তাইমিয়া যিনি একজন বিশেষজ্ঞ

এছাড়াও আরো দেখবেন, শেখ শাওকানীর মতামত। তিনি বলেছেন, “যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে নতজানু হয়, এবং ব্যাপারটা সে না জানে তাহলে সে অবিশ্বাসী নয়।"

শেখ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহহাব (র) বলেছেন, “আমরা তাদেরকে অবিশ্বাসী বা কাফির বলি না; যারা আব্দুল কাদিরের মূর্তি বানিয়ে বা তার কবরের সামনে নতজানু হয় অথবা আহমদ নাখতাওয়ীর মূর্তি বা তার কবরের সামনে নতজানু হয়’

তাহলে তাদেরকে কীভাবে আমরা অবিশ্বাসী বলি যারা শিরক বরে না? আমরা বলি, আমরা অনেক জানি; আমরা অন্যদেরকে বলি কাফির ইত্যাদি।

লেকচার শেষ করার আগে নবীজীর দুটো হাদীসের কথা বলবো। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- (সহীহ মুসলিম তিন নং খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৬৫) "একটা সময় আসবে যে সময় সমাজে অনেক খারাপ কাজ হবে। আর কখনো যদি কেউ মুসলিম উম্মাহর একতা ন করতে চায় তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করো। আর তাতেও যদি সে ক্ষান্ত না হয় তাহলে তাকে মেরে ফেলো

লেকচার শেষ করার আগে নবীজীর আরো একটি হাদীসের কথা বলবো। সহীহ বুখারীর ৪ নং খণ্ড, হাদীস নং ৩৬০৬। এই হাদীসের বলেই আমি শেষ করবো। এখানে হুৃযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেছেন, লোকজন নবীজী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতো কোন জিনিসটা ভালো? তবে আমি ভয় পেয়ে নবীজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনটা খারাপ জিনিস? তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, অজ্ঞানতরা কারণে আমরা অনেক খারাপ কাজ করেছি; আলাহ আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। এরপরে কি আর কোনো খারাপ কাজ হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হাঁ, খারাপ কাজ হবে। তিনি বললেন, সেই খারাপ কাজের পরে কি কোনো ভালো কাজ হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হাঁ; (ভালো কাজ হবে) তবে সেটার মধ্যেও কিছু খারাপ কাজ থাকবে।
সাহাবীগণ বললেন, সেই খারাপ কাজ কা? নবীজী (সাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক থাকবে, যারা এমন কিছু জিনিস প্রচার করবে যেগুলো আমার সুন্নাহ নয়। সাহাবীগণ বললেন, এটার পর আরো কোনো খারাপ কাজ কি হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হাঁ: কিছু লোক থাকবে যারা তোমাদের দোযখে আমন্ত্রণ জানাবে। তখন হুযাইফা (রা) বললেন, সে সময় আমাদের কী করা উচিত? নবীজী (সাঃ) তখন বললেন, তোমরা তোমাদের মুসলিম দল আর নেতাকে আকড়ে ধরে থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, কোনো মুসলিম নেতা আর দল না থাকলে কি করবো? নবীজী (সাঃ) উতর দিলেন, যদি কোনো মুসলিম নেতা আর দল না থাকে তাহলে সব দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিম করে ফেলো। প্রয়োজন হলে গাছের শেকড় কামড়ে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহর সামনা সামনি হচ্ছো।

বিভেদ থেকে মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা।

বিভেদ মানবেতিহাসের প্রাচীনতম সংক্রামক রোগ। প্রতিযুগে নবী রাসুলদের আগমনের ফলে এই রোগ কখনো মানব জাতির উপর চুড়ান্ত আঘাত হানতে পারেনি। যখনই মানব সমাজ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিভেদে লিপ্ত হতো, নবীরা আগমন করে খিলাফতের দায়িত্বানুভূতি নবতর উপায়ে সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নবীদের শিক্ষাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি। মানবেতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এই ব্যবস্থার পুনারাবৃত্তি হয়েছে বারে বারে। এ জন্যে পূর্বতন উম্মতদের মধ্যে বিভেদ দূর করার জন্য কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু যেহেতু নবী আসবেন না। তাই কিয়াম বনবী সর্বশেষ নবী, তারপর আর কোন শেষ নবীর শিক্ষাকে জীবন্ত রাখার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য্য। তাই মুসলিম উম্মাহর বিভেদে এর মূল অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়ে পড়ে, সেজন্যে বিভেদ থেকে মুক্তির জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা রাখা খুবই যুক্তি সংগত। আল্লাহপাক তার শেষ নবীকে এমনি এক সুদৃঢ় ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, যা ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরমুলা। এরই মাধ্যমে এই উম্মাহ বিভেদের মাঝে ঐক্যের রাজপথে উত্তরণ করতে পারে। যারা পূর্বতন উম্মতদের বিভেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবে না ও শেষ নবীর ঐক্যের ফরমুলা গ্রহণ করবে না, তারাই বিভেদের শিকার হবে। কোরআনে মজিদে এই সুস্পষ্ট মূলনীতি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে;

يا ايها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعو الرسول و اولى الأمر منكم ، فان تنازعتم في شتى فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير و أحسن تأويلا-

)النساء(

(হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং আনুগত্য করবে রাসুলের এবং তাদের যারা নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রাখে। যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি প্রত্যার্পন করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখো। এটাই উত্তম ও পরিনামের দিক দিয়ে ভাল।)

এই আয়াতে আল্লাহপাক তিনটি আনুগত্যের কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি হলো মূল আনুগত্যের কেন্দ্র আর তৃতীয়টি হলো প্রথম মূল দুটি আনুগত্যেরই অধীন। কোরআনের আয়াতে)اطيعوا('আনুগত্য করো' শব্দটি দুইবার দুইটি কেন্দ্রের সাথে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় আনুগত্যের কেন্দ্রটির আগে এই শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় য়ে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যই মূল আনুগত্য।

উলিল আমর (নির্দেশের অধিকারী) এর আনুগত্য কোন মৌলিক আনুগত্য নয়। এ জন্যে আয়াতে এর পূর্বে 'আনুগত্য করো' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের আনুগত্য আসলে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের অধীন। এর অর্থ এই যে তাদের নির্দেশ যদি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের গন্ডির মধ্যে হয় তবেই তাদের আনুগত্য করতে হবে। অন্যথায় তাদের আনুগত্য বৈধ নয়। বস্তুতঃ আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহরই। কিন্তু নবীর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব নয়। নবীর আনুগত্যকে অস্বীকার করলে আল্লাহর আনুগত্যকেই অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ এরসাদ করেছেন,

من يولع الرسول فقد اطاع الله-

(যারা রাসুলের অনুসরণ করলো তারা আল্লাহরই অনুসরণ করলো)

এজন্যে রাসুলের আনুগত্যকে মূল আনুগত্যের কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উলিল আমর' এর মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অন্তর্ভূক্ত যারা কোন না
কোন পর্যায়ে দায়িত্বশীল। সরকার, নেতা, পীর, সেনাপতি, বিচারপতি, উলেমা সহ সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলরা শামিল রয়েছেন। মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সামষ্ঠিক জীবন ব্যাহত হতে না পারে এই লক্ষ্যে এই আনুগত্য অপরিহার্য। আনুগত্যের এই অধিকারীদেরকে অবশ্যই মুমিন হতে হবে। অমুসলিমদের জন্যে কোন আনুগত্য নেই। কোরআনের আয়াতে)منكم তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দের ছাড়া একথাটি সুস্পষ্ট। হাদিসে বলা হয়েছে;

الاطاعة في معصية النما الطاعة فى المعروف - (متفق عليه)

(আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানীর মধ্যে আনুগত্য নেই, বরং সৎকাজের মধ্যেই আনুগত্য।)

الاطاعة لمخلوق في معصية الخالق-

(দ্রষ্টার অবাধ্যতার মাধ্যমে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।)

যখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন দেখা দেবে তা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি প্রত্যার্পন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যই মুখ্য হতে হবে। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের পরিপন্থি কোন ফয়সালা দেবার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ ও রাসুলের

আনুগত্যের পরিপন্থি যে কোন ধরনের ফয়সালা, তা যাদের তরফ থেকেই হোক না কেন, তার আনুগত্য বৈধ নয়। এই মূলনীতি থেকে সুস্পষ্ট হ'য়ে যায় যে ইসলামে কোন পোপবাদ বা ধার্মিকদের শাসন বলে কিছু নেই, যাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Theocracy বলা হয়েছে। শাসক বা অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ধার্মিক হলেই তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য পাবার অধিকার নেই। বরং প্রতিটি বিষয়ের আনুগত্য স্বতন্ত ভাবে আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের নিক্তিতেই পরিমাপ করতে হবে।

কোরআন হলো আনুগত্যের মূলকেন্দ আর কুরআনের ব্যাখা হলো সুন্নাহ। সুন্নাহর অর্থ হলো, রাসুলের আদেশ ও নিষেধ, (কথা) তার আমল এবং কারো কোন কথা বা কাজের প্রতি সমর্থন দান। কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন তৃতীয় পক্ষের নিজস্ব কোন আনুগত্য নেই। উলুল আমরের আনুগত্য তথা ইযমা বা কিয়াস বস্তুতঃ কোরআন ও হাদিসেরই অনুসরণ। ইসলামী আনুগত্যের এই দুই উৎস সম্পর্কে কোরআনে মজিদে ও হাদিসে বার বার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরসাদ হয়েছে, فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت

ويسلموا تسليما - (النساء(

(আপনার রবের শপথ, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিস্পত্তিতে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে তারা মুমিন হতে পারবেনা। অতঃপর তারা আপনার ফয়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা পাবেনা ও মনে প্রাণে আত্মসমর্পন করবে।)

ما كان المومن و لا مومنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم و من بعض الله و رسوله فقد ضل ضلا لا مبينا - (الاحزاب) (কোন ইমানদার নর কিংবা নারীর জন্যে কোন স্বাধীনতাই থাকবেনা যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল ফয়সালা দিয়ে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের

ফয়সালার উপরে নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেবার কোন অবকাশ নেই।)

. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

(যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ করো, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।)

ان الذين يبايعونك انما يباعون الله يد الله فوق ايديهم . (যারা আপনার কাছে বাইয়াত করে তারা আল্লাহরই কাছে বাইয়াত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে।)

(و ما أنا كم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا - (الحشر (আল্লাহর রাসুল যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, আর যে সব কিছু থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো।)

(فامنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير - (التغابن (অতঃপর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান নাও এবং ঐ নূরের উপর বিশ্বাস করো যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা ওয়াকিফহাল।)

وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله - (النساء(

(আমি যতো রাসুল পাঠিয়েছি সবাইকে আল্লাহর নির্দেশে আনুগত্য করার জন্যেই পাঠিয়েছি।) হাদিসে বলা হয়েছে,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم هما كتاب الله وسنة رسوله (المشكوة(

(আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত। তোমরা যতদিন এ দু'টাকে অবলম্বন করে রাখবে, কখনো বিপথগামী হবেনা।)

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها و حرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدوداً فلا تعتدوها و

سكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها - (المشكوة(
(আল্লাহ ফরজ সমূহ নির্ধারন করেছেন, সে সব ছেড়ে দিওনা, এবং হারাম সমুহকে অবৈধ করে দিয়েছেন, সে সব লংঘন করোনা, এবং দ্বীনের সীমা নির্ধারন করে দিয়েছেন, সে সীমা অতিক্রম করো না, এবং কিছু বিষয়ে জেনে শুনে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা সে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করোনা।)

মূলনীতি বাস্তবায়নে সাহাবাদের ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরামদের যামানা পর্যন্ত এই মূলনীতিকে সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ান করা হতো। তারা সকল বিষয়ে আল্লাহর নবীর উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করতেন। তারা রাসুলের মতামতকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। কোন ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমান চাইতেন না। তারা জানতেন ও বিশ্বাস করতেন যে রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। তৃতীয় কেন্দ্রের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ছিলো। হযরত উমর বলেছেন,

أيها الناس انما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مصيبا لان الله كان يريه و انما هو منا

الظن و التكلف.

(হে জনগণ, আল্লাহর নবীর রায় সঠিক হতো, এ জন্যে যে তা আল্লাহর তরফ থেকে আসত, আল্লাহর সিদ্ধান্তই নবীর রায় হতো। পক্ষান্তরে আমাদের রায় হলো অনুমান ও ধারনা সর্বস্ব।) একদা হযরত উমরের সেক্রেটারী তার এক সিদ্ধান্তের ভূমিকায় লিখেছিলেন;

هذا ما ارأى الله امير المومنين (عمر(

"এই সিদ্ধান্তটি তাই যা আল্লাহ পাক আমেরুল মুমেনীন উমরের ধারনায় অর্পণ করেছেন", হযরত উমর এতে আপত্তি করে নিচের কথাটি লিখতে বললেন,

هذا ما رأى أمير المومنين (عمر(

(এই সিদ্ধান্ত আমিরুল মুমেনীন উমরের ধারনা মতে দেয়া হয়েছে) তারা আমেরুল মুমেনীনের আনুগত্যকে সতন্ত্রভাবে আনুগত্যের কেন্দ্র মনে করতেন না, বরং তারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যকেই আনুগত্যের মূল সুত্র মনে করতেন।

সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা, কেননা তারা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সাহাবাদের পরবর্তিকালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কোরআন ও সুন্নাহকে আনুগত্যের মূলকেন্দ্র হিসেবে মেনে নেয়া সত্বেও এর মর্ম নির্ধারনে ভিন্নমতের উদ্ভব ঘটে। এ জন্যে পরবর্তিকালের লোকদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামদে ঐক্যে

যতো বিভেদেই হয়েছে, বা মতকে মানদন্ড করা হয়েছে। উম্মাহর চান স্বতন্ত্র মত বা পথ বের করেছেন,

সবাই দাবী করেছেন যে তাদেরই মতামতই কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখা। সকল বিভেদের উদ্যোক্তারাই তাদের ভিন্নমতের জন্যে কোরআনকেই বুনিয়াদ বানিয়েছেন। অন্যকথায় তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোরআনের ব্যাখা দিয়েছেন। এ জন্যে আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদের মতামতকে সত্যের মানদন্ড বানিয়েছেন। কেননা নবীর পর দ্বীন বা শরীয়তের সঠিক ব্যাখা দেবার যোগ্যতা সাহাবাদেরই বেশী। যারা সুদীর্ঘ সময় ধরে রাসুলের সাহচর্য্যে ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। কোরআন হাদিসের সঠিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তাদের চেয়ে বেশী আর কেউ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনা। অর্থাৎ নবী জীবনের আদর্শে যেমন কোরআনের সঠিক ব্যাখা ও প্রয়োগ সুস্পষ্ট, তেমনি বৃহত্তর প্রয়োগে ও ব্যাখায় নবী পরবর্তিকালে সাহাবারা উম্মতের জন্যে নমুনা। এ পথেই উম্মত ব্যাপকতর বিরোধের পথ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণের তাগিদ উম্মাহর জন্যে বিশেষ রহমত স্বরূপ। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন

فانه من يعش منكم فيرى اختلافا كثيرا - فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ واياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل

ضلالة في النار-

(তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক বিভেদ দেখতে পাবে, সে অবস্থায় তোমাদের করনীয় হবে আমার সুন্নাত মেনে চলা ও মেনে চলা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে, যারা নিজেরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন। তাদের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন অবাঞ্ছিত নতুনত্ব, প্রত্যেকটি নবতর সংযোজন হলো বিভ্রান্তি বা গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে যাবে।)

এই হাদীসে আল্লাহর রাসুলের সুন্নতের অনুসরণের সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে ও অনুসরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, সুন্নতে রাসুল বুঝতে অসুবিধে হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাখ্যা মেনে নিতে হবে। রাসুলের পর দ্বীন ইসলামের পথে

ঐক্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো ৩০ বছরের জন্য আরো একটি মজবুত ভিত্তি দিয়ে দেয়া হলো, যা বিভেদের বিপদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করবে। রাসুলের ভাষায় এই খিলাফত সম্পর্কে স্পষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে,

الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

(আমার পর ৩০ বছর খিলাফত টিকে থাকবে অতঃপর আসবে রাজতন্ত্র)
হযরত আলীর সাহাদাতের মধ্যে দিয়ে খিলাফতের যুগ শেষ হয়ে যায়। এখানে ঈমামগণ উল্লেখ করেছেন যে যদি খিলাফতে রাশেদার যুগের আদর্শিক চরিত্র পরবর্তী কোন নেতৃত্বে প্রকাশ পায় তবে তাকে ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এ কারণেই পরবর্তীযুগের উমর বিন আবদুল আযিয-কে খলিফায়ে রাশেদের সম্মান দেয়া হয়েছে, বা তার যুগকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলা হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের খিলাফত ৩০ বছরেই শেষ হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কেরাম কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখায় মানদন্ড

আল্লাহর নবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের উপর খুবই আস্থা রাখতেন, তাদের সার্বিক চরিত্র গড়ে উঠেছিলো আল্লাহর নবীর সহচার্যে। তারা কোরআনের মর্মে, এর প্রয়োগে ও নবীর সুন্নতের হিকমত সম্পর্কে যতো ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান রাখতেন। সে পর্যায়ের জ্ঞান অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নবী তার নবুয়তী জ্ঞানে জানতেন যে পরবর্তীযুগে মুসলমানদের মাঝে বিভেদের সুত্রপাত হবে। ইসলামের সঠিক পথের অন্বেষায় বিভেদের বুনিয়াদ পড়বে। এ জন্যে তিনি তার সর্বাধিক বিশ্বস্থ সহচরদের কাছ থেকে সঠিক ব্যাখ্যা নেবার জন্যে অসিয়ত করে গেলেন। সাহাবাদের ঈমান, জ্ঞান ইসলামী চরিত্রের প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এরসাদ হয়েছে,

صحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم-

(আমাদের সাহাবারা তারকা সাদৃশ্য, তাদের মধ্যে তোমরা যাকেই অনুকরণ করো না কেন, তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে।)

এখানে আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাহাবাদের প্রশংসা করা নয়, বরং এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে সাহাবাদের জামাত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র, নিষ্ঠা ও দ্বীনি জ্ঞানে পরবর্তীযুগের মুসলমানদের জন্যে অনুসরণীয়। সাহাবাদের সামষ্ঠিক জীবনে ইসলামের যে চিত্র ও রূপ ফুটে উঠেছে, সেটাই ইসলামী ব্যবস্থার আসল মডেল। যে কোন ধরনের মত-পার্থক্যে ও বিভেদে এবং দ্বীনি সমস্যার সমাধানে সাহাবাদের জীবনকে মানদন্ড হিসেবে মেনে নিতে হবে। ইবাদাত-বন্দিগীতে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে, দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে, পারস্পারিক বিরোধ নিস্পত্তিতে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও অপরাপর সকল প্রয়োজনে সাহাবায়ে কেরামদের মডেলকে সামনে রাখতে হবে। ইসলামের যে চিত্র সেখানে পাওয়া যায় সেটাই ইসলামের আসল চিত্র। সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ পদ্ধতির চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি আর কারো কাছে আশা করা যায় না। কাজেই এ কথা বলার কারো দুঃসাহস করা উচিত নয় যে দ্বীনের কোন কোন বিষয়ে

হয়েছেন। হ্যাঁ, ইসলামের মূল শিক্ষা বা সাহাবায়ে কেরামদের প্রয়োগের মাঝে যেখানে বিভিন্ন মতামতের সুযোগ রয়েছে বা উম্মতের সার্বিক স্বার্থে যেখানে চিন্তা গবেষণা ও বিভিন্ন পথ ও মতের সন্ধান করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, সেখানে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি। বরং ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ খোলা রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণও সে সব ক্ষেত্রে এ অধিকার খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করে পরবর্তিযুগের লোকদের জন্যে আদর্শ রেখে গেছেন। আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত যেখানে ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ খোলা রেখেছে, সেখানে ভিন্নমত বা রায় কোন বিভেদ নয়। একে অভিশাপ না বলে রহমত বলা হয়েছে। ইসলামের মত একটি আদর্শ যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অসংখ্য ভাষাভাষী ও ভৌগলিক এলাকার লোকেরা মানবে তাদের সমস্যার ধরণ ও বিভিন্নতাকে ইসলামের ঐক্য- সূত্রে অভিন্ন উম্মাহ হিসেবে টিকিয়ে রাখবে। সেখানে ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে একটা গতিশীল আদর্শ চলতে পারেনা। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে ইজতিহাদের নিয়ম-পদ্ধতি গুলো সাহাবাদের আমল থেকে নিতে হবে। যদি সাহাবা পরবর্তীকালে যদি সার্বিকভাবে আন্তরিকতার সাথে এই মূলনীতিকে কার্যকরী করা হতো। তবে এই মুসলিম উম্মাহ অধিকাংশ অবাঞ্ছিত বিভেদের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারতো। আবার যদি আজকের মুসলিম উম্মাহ এই মূলনীতিকে সকল বিভেদের মিমাংসায় মূলনীতি হিসেবে মেনে নেয় তবে অধিকাংশ বিভেদের অবসান ঘটতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করার হিকমত এটাও যে কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন পটভূমিতে। সাহাবায়ে কেরামগণ

আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকের পান্ডিত্য ছিলো সর্বস্বীকৃত। তারা আয়াতগুলোর অবতীর্ণ হবার পটভূমি সহ সার্বিক অর্থ সাথে সাথে বুঝতে পারতেন, যদি কোথাও ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করতেন, সাথে সাথে রাসুলের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। তাই কোরআনের শাব্দিক ও অভ্যন্তরীণ সব অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যেতো, কোন বিশেষ তাৎপর্যই গোপন থাকতো না। বস্তুতঃ কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা কোন দার্শনিক তত্ব নয়, বরং সুস্পষ্ঠ হিদায়াত, কোরআন ও সুন্নাহর সমগ্র শিক্ষা এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরেই অবতীর্ণ। এর মধ্যে নিত্য নতুন অর্থ খুঁজে বের করার কোন অবকাশ নেই। সাহাবায়ে কেরামগণই এর শব্দ ও অর্থের রক্ষক। রক্ষকদের ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ে এই ইলমের শাব্দিক ও অর্ন্তনিহিত মর্মার্থ খুঁজে বের করতে অনেক সুড়ঙ্গ পথ বের করে বিভেদের পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সবই এই মূলনীতিকে অবহেলা করার বিষফল।

বস্তুতঃ কোন রাসুলকেই তার সহচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও নবুয়তী মিশনে তার সাফল্য তার সহচরদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। মহানবীর সহচরদের মতো এমন বলিষ্ঠ ও অনাবিল চরিত্রের অধিকারী সহচর আর কোন নবী-রাসুল পাননি। অনেক ইহুদী পন্ডিতও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন,
অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এভাবে যে যদি তাদের নবীর সাথে এমনি অনাবিল চরিত্রের অধিকারী একদল সাথী থাকতেন, তবে তাদের ধর্ম দীর্ঘদিন ধরে অজানা হয়ে থাকতো না। এমনি চরিত্রের সাহাবাদেরকেই এই উম্মতের জন্য অনুসরণীয় করা হয়েছে।

এই মূলনীতিতে ইসলামের শিক্ষাকে তার মৌলিকত্বের উপর স্থায়ীত্ব প্রদান করার পর দ্বীনের বিষয়ে পরবর্তীযুগে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করার প্রয়াসকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কোন নতুনত্ব সৃষ্টির কোনও প্রয়াসকেই ইসলামী পরিভাষায় বিদয়াত বলা হয়েছে।

বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপ

বিদয়াত আরবী শব্দ (৬) থেকে এসেছে, এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'নতুন সৃষ্টি' 'নিজের বানানো' বা 'ভিত্তিহীন কোন কথা বা কাজ'।

কোরআনের আয়াতে এই শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:-

)بديع السموات والارض(আল্লাহ আসমান জমিনকে নতুনভাবে সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ আসমান-জমিন সৃষ্টিতে আল্লাহ কোন নমুনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেন নি, বরং সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে,

o ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم(

নিয়েছে, যা আমি তাদের উপর ফরজ করিনি।

এমনিড়ারে অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

)قل ما كنت بدعامن الرسل(-বলুন আমি কোন উদ্ভট (নতুন) নবী নই। অর্থাৎ নবুয়তের চিরন্তন ধারারই আমি একজন নবী, নবতর কোন কিছু নই। প্রথম আয়াতে 'নবতর সৃষ্টির' অর্থে, দ্বিতীয় আয়াতে 'নিজেদের বানানা বা ভিত্তিহীন' অর্থে ও তৃতীয় আয়াতে 'উদ্ভট বা নবতর সংযোজনার' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু শরীয়তে বিদয়াতের অর্থ একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, কিন্তু সার্বিকভাবে

উপরের অর্থগুলো অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে বিদয়াত বলা হয় দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন বিষয়ের সংযোজন করা, যার অস্তিত্ব কোরআনে মজিদে বা রাসুলের সুন্নাহ বা সাহাবায়ে কেরামদের যুগে ছিলো না, বা প্রসিদ্ধ ঈমামদের ইজতিহাদে অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে যা দ্বীনের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। যাকে দ্বীনের কাজ মনে করে এর অংশে পরিণত করা হয়েছে।
যে সব হাদিসে বিদয়াতের সমালোচনা করে উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো;

ايا كم و محدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. (তোমরা দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা দ্বীনের ব্যাপারে নবতর সংযোজন হলো অবাঞ্ছিত নতুনত্ব। প্রত্যেক অবাঞ্ছিত নতুনত্ব গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে যাবে) অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে;

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد - رواه البخاري والمسلم(

(যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে যা এর মধ্যে ছিলো না। তবে তা পরিত্যক্ত হবে)

ما أحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة . (যখন কোন কওম বেদয়াত সৃষ্টি করে, সেই বিদয়াতের পরিমাণে সুন্নাত উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই ঐ (উঠিয়ে নেয়া) সুন্নতের অনুসরণই তাদের জন্যে বিদয়াত সৃষ্টির চাইতে উত্তম।)

- ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة (যখন কোন কওম তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদয়াত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহপাক তাদের ঐ সব সুন্নত থেকে যার উপর তারা আমল করতো, কিছু অংশ ছিনিয়ে নেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সব ছিনিয়ে নেয়া সুন্নত আর ফেরত দেয়া হবে না।)

من وقر صاحب بدعة فقداعات على هدم الإسلام -(যে ব্যক্তি কোন বিদয়াতপন্থী লোককে সম্মান দেবে, সে ইসলামকেই ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।)

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما و لاصلوة و لاحجاً ولا عمرة و لاجهادا ولا صرفا ولا عدلا

يخرج عن الاسلام كما يخرج الشعر من العجين.

(আল্লাহপাক বেদয়াতপন্থী ব্যক্তির কোন রোজা, নামাজ, হজ্ব, উমরাহ, জিহাদ, ফরজ বা নফল, কবুল করবেন না, তারা দ্বীন ইসলাম থেকে এমনি বেরিয়ে যাবে যেমন আটা থেকে চুল বেরিয়ে আসে।)

ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.

(আল্লাহপাক বিদয়াতপন্থী লোকদের জন্য তওবার দরজা বন্ধ রেখেছেন, যতক্ষণ না তারা বিদয়াতের পথ ছেড়ে না দেয়।)

خير الهدي هدى محمد و شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
(সকল রাস্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাস্তা হলো হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এবং সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো নতুনত্ব, দ্বীনের প্রত্যেক নতুনত্বই গোমরাহী।)

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিদয়াত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এজন্যেই আল্লাহর নবী এই অভিশাপ থেকে দুরে সরে থাকার জন্যে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোন আমলকে তখনই বিদয়াত বলা যাবে, যখন তার মধ্যে নিচের কয়েকটি শর্ত পাওয়া যাবে।

প্রথমতঃ দ্বীনের মধ্যে কোন নবতর সংযোজন। মানুষের জীবনের ব্যবহারিক বা বস্তুগত কোন বিষয়ে নবতর সংযোজনাকে বিদয়াত বলা হয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক প্রগতির নবতর কাঠামো ও এই পর্যায়ের নতুনত্ব, যা বিদয়াতের মধ্যে পড়ে না। শুধুমাত্র দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করাকেই বিদয়াত বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ রাসুলের কিংবা সাহাবাদের যামানায় যে সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের অবকাশ থাকা সত্বেও সে সবের অনুপস্থিতি। কিন্তু পরের যামানায় সে সব বিষয় সংযোজন করা। যেমন ইবাদাত-বন্দেগীর কোন ও আমল যা রাসুল বা সাহাবাদের যামানায় খুঁজে পাওয়া না যায়। কিন্তু পরবর্তি যামানায় তার সংযোজন। কেন না নবী বা সাহাবাদের চেয়ে আর কেউ ইবাদাত বন্দেগীতে বেশী তৎপর, তা চিন্তা করা যায় না। যতো ধরনের আমলের মাধ্যমে ইবাদাত বান্দেগী করা যায়, বা আল্লাহর সন্তোষ লাভকরা যায়, তার কোনটাই তারা ছেড়ে দেননি, তাই নবী ও সাহাবারা যে সমস্ত আমলকে ইবাদাত হিসেবে গ্রহণ করেন নি, সেগুলো আসলে ইবাদাত নয়। তেমনি আমলের সংযোজনকেই বিদয়াত বলা হবে।

তৃতীয়ত: দ্বীনের মধ্যে এমন কাজের সংযোজন যাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হবে। সেই কাজ যারা করবে তাদেরকে ভাল এবং যারা করবেনা তাদেরকে মন্দ বলা হবে।

চতুর্থত: যে নবতর সংযোজিত কাজকে অপরিহার্য কাজ মনে করা। সেই কাজ করা বা না করাকে ভাল বা মন্দের মানদন্ড করা। সে গুলো করলে শুধু সোয়াবই হয়না, বরং যারা করেনা তারা গোনাহগার হবে। অর্থাৎ কাজটিকে দ্বীনের জন্য অপরিহার্য কাজ বলে বিবেচনা করা। উপরে উল্লেখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে তাকে বিদয়াত বলা হবে। এমনি বিদয়াতের কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষনা করেছে এবং পরবর্তীযুগে এ ধরনের কাজই বিভেদ ও বিরোধের পথ খুলে দিয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে।

ইসলামে এই বিদয়াতকে অবৈধ করা হয়েছে যে সমস্ত কারণে তা নিম্নে

উল্লেখ করা হলো,

১. আল্লাহ পাক এরসাদ করেছেন,

اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت و رضيت لكم الاسلام دينا.

(আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে আমি ইসলামকেই পছন্দ করেছি।)

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে জানিয়েছেন যে তিনি তার মনোনীত দ্বীন হিসেবে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগ, মূল বিষয় গুলো তথা এর শাখা প্রশাখাকে পূর্ণ অব্যয়বে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, এর মধ্যে নতুন কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। তাই বিদয়াতের প্রয়াস কোরআন বিরোধী ও পরিতাজ্য। ইমান মালেক এর কি সুন্দর ব্যাখা দিয়েছেন এভাবে,

من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه و سلم خان الرسالة فان الله سبحانه يقول اليوم اكملت لكم دينكم ، فما لم يكن يومئذ دينا فلايكون اليوم دينا (যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদয়াত সৃষ্টি করে এবং তাকে নেকীর কাজ মনে করে, সে পক্ষান্তরে এ কথাই ঘোষনা করে যে আল্লাহর নবী তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন)نعوذ بالله(কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি। তাই যে কাজ রাসূলের যামানায় দ্বীন হিসাবে পরিগণিত ছিলো না, তা আজ ও দ্বীন হতে পারে না।)

ইসলাম পুনাংগ দ্বীন দিয়েছে, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছে। এ সব কিছুর নিয়ম নীতি পেশ করেছে। কোন বিষয়েই নতুন কিছু সৃষ্টি করার কোন অবকাশ রাখা হয়নি।

মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত যে কোন নব্য দ্বীনি কাজ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এর দ্বারা মিল্লাতের কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ হয়েছে বেশী। যদি ঐ

নতুন কাজটির প্রচলন করা না হতো তবে ইসলামের কি ক্ষতি হতো? পক্ষান্তরে ঐ নব্য কাজটির প্রচলনে ইসলামের ক্ষতির কোন হিসাব নেই।

২. ইসলাম- সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ। বিদয়াতের প্রয়াস এই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে অসংখ্য বিভেদের পথ খুলে যায়।
৩. বিদয়াতের পথে চলা দ্বীনকে ধ্বংশ করার কাজ।

৪. বিদয়াতের আমলে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে এই গোনাহতে লিপ্ত হবার ফলে তওয়াব পথে ফিরে না আসার কারণে গোমরাহী বাড়তেই থাকে। মোহাদ্দেসীন, ফোকাহা ও উলেমারা এই বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন এবং এ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তরিকতের মাশায়েখগণ ও মুসলিম উম্মাহকে বিদয়াতের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে দূরে সরে থাকার আহবান জানিয়েছেন। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) দ্বীন ও শরীয়তের সুবিশাল দুর্গ ছিলেন। তার শিক্ষার মূল কথা ছিলো- সুন্নত ও শরীয়তের অনুসরণ। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ)غنية الطالبين(এর মূল বিষয় বস্তুই রেখেছেন শরীয়তের অনুসরণ। তার মতে শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া তরিকতের কথা চিন্তাও করা যায় না। তিনি তরিকতকে শরীয়তের অধিনস্ত দাস বানিয়েছেন। তার উপদেশ)فتوح الغيب(ك দ্বিতীয় খোতবায় তিনি বিদয়াতের কুফল সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শিরোনামাতে লিখেছেন العوا ولا تبتدعوا(সুন্নতের বা শরীয়তের অনুসরণ করো, বিদয়াতের পথ পরিহার করো) তিনি তার কিতাবে ফরজ, সুন্নত ও নফলের সীমা নির্ধারন করে শরীয়তের মূল শিক্ষাকে সমুন্নত রেখেছেন।

ইলমে তাসাউফের প্রসিদ্ধ কিতাব)عوارف المعارف(-এর লেখক শেইখ শেহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী (রঃ) তার কিতাবে বিদয়াতের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তরীকতপন্থীদের এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তারা শরীয়ত বহির্ভূত কোন বিদয়াতী কাজকে তরীকতের জন্য উপকারী বলে মনে না করেন। মোজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) তাঁর সারা জীবন ধরে বিদয়াতের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি তার লিখনীতে বিদয়াতকে 'ভাল ও মন্দ' দু'ভাগে ভাগ করার বিরূদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ প্রদত্ত এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে কোন নব্য সংযোজনকে)بدعة حسنة('ভাল বিদয়াত' বলে আখ্যায়িত করা মোটেই সমিচীন নয়। বিদয়াত বিদয়াতই, তা কখনও ভাল ও কল্যাণকর হতে পারে না।

বিদয়াতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নিজেদের ইচ্ছামতো আমল করে তাকে সোয়াবের কাজ মনে করার ফলে এক নতুন ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ এই বিভক্তি বিদয়াতের অপরাধকে এর ধারকের মনে লঘু করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ তাকেবিভক্তি বিদয়াতের অপরাধকে এর ধারকের মনে লঘু করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ তাকে সাহসী করে তুলে, শেষে কোন বিদয়াতই অপরাধ বলে মনে হয় না। এ জন্যেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইমামগণ এই বিভক্তির বিপক্ষে। কিন্তু আজও এই বিভক্তির চোরাগলীতে অহরহ বিদয়াত সংঘঠিত হচ্ছে। মোজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) এই ফিতনার বিরূদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তারই পথ ধরে হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) ও সাইয়েদ আহমেদ বেরেলভী (রঃ) এই ফিতনার বিরূদ্ধে সর্বেতোভাবে জিহাদ করেন। তারা বিদয়াত মুক্ত সুন্নতের অনুসরনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু বিদয়াত আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। বিদয়াতের আকর্ষনই এমন যে তাকে উৎপাটিত করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। তাসাউফের নামেই অধিকাংশ বিদয়াত প্রচলিত। সত্যিকার তরিকতপন্থী কখনও বিদয়াতপন্থী হ'তে পারে না। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর রাসুলের দেয়া ফরমুলাকে অবহেলা করার ফলেই এই অভিশাপ আমাদের ঐক্যকে ভূলুণ্ঠিত করছে।

আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপই এখানে আলোচ্য। এর বিচিত্র রূপ ও প্রয়োগ পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে।

সাহাবায়ে কেরামদেরকে মানদন্ড করার হিকমত

অনাদিকালের জন্যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে বা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উম্মতের জন্য মানদন্ড করার পেছনে আল্লাহর বিশেষ হিকমত রয়েছে।

শুধু অহীর মাধ্যমে নির্দেশাবলী নাযিল করেই আল্লাহ দ্বীন ও শরীয়ত জারী করেন নি, বরং নবী জীবনের বাস্তব আমল বা অহীর প্রয়োগের মাঝে এ দ্বীন বাস্তবায়িত হয়েছে। ইবাদাত-বন্দেগীতে, পারিবারিক দায়ীত্ব পালনে, সামাজিক জীবন যাত্রায়, পারস্পারিক লেনদেন ও ব্যবসা-বানিজ্যে, দেশ পরিচালনায়, কূটনৈতিক বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নে, অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে তথা মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজনে ইসলামী দ্বীন ও শরীয়তের বিধান চালু করার লক্ষ্যে নবী-জীবনের আমলকে মানদন্ড করা হয়েছে। এমন কি মানবীয় দূর্বলতার কারনে সাধারন মানুষের জীবনে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, তাও

নবী জীবনের বাস্তব আমলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসংগে যে মূলনীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলো, যে আমল ও কাজ নবুয়তী মর্যাদার পরিপন্থী নয়, তেমনি সকল ধরনের কাজ ও নবী জীবনের আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমন রাসুলেপাকের জীবনে ফজরের নামাজ কাজা হয়েছে, সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙ্গার ফলে নামাজ কাজা হয়ে যায়। তাই ক্বাজা নামাজ পড়ার নিয়মও রাসুলের আমলের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। রাসুলের জন্য নামাজ কাজা হওয়া নবুয়তি মর্যাদার পরিপন্থি নয় এই বিশেষ লক্ষ্যে। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

الی لا أنسی و لکن أنسی لأمن-

(আমি ভুলে যাইনি, বরং আমাকে ভুলানো হয়েছে, যেনো সুন্নত জারী করতে পারি) নামাজে ভুল সংশোধনের উপায় হিসাবে 'সুহ সিজদা' এর ব্যবস্থা, পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করার বৈধতা, বিধবা বিবাহর ব্যবস্থা সহ অনেক আমল নবী জীবনের বাস্তব আমলে তুলে ধরা হয়েছে। যেনো তিনি অনুসরণের জন্য বাস্তব নমুনা হতে পারেন। আবার কোন জায়েজ কাজ যাকে শরীয়তে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাকে ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বাস্তব আমল রাসুলের জীবনে করানো হয়নি। যেমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীয়তে যায়েজ। কিন্তু তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃনিত কাজ, তাই এর বাস্তব আমল রাসুলের জীবনে দেয়া হয়নি।

যে সমস্ত গোনাহর কাজ শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যদি কখনও সাহাবাদের মধ্যে কারো মানবিক দূর্বলতার কারণে সংগঠিত হয়েছে, তখন আল্লাহর নবী শরীয়তের বিধান চালু করেছেন। যা ইম্মতের জন্য হায়ী আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে পরবর্তীযুগের মানদন্ড হিসেবে।

কিন্তু এমন কিছু গোনাহর কাজ যা রাসুলের যামানায় সংগঠিত হওয়া বাস্তবে সম্ভব ছিলো না, যেমন রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে কোন্দল, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের তরফ থেকে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক অর্থ না বুঝবার ফলে ফিতনা বা বিভেদ সৃষ্টি হওয়া। এমনি ধরনের গোনাহর কাজ যার পরিবেশ বা পটভূমি রাসুলের যামানায় সৃষ্টি হয়নি। এসব ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করার বাস্তব নমুনা রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিলো।

সাহাবায়ে কেরামগণ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ছিলেন। তাদের আমল-আখলাক রাসুলেপাকের সরাসরি তত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলো। তাদের দ্বারাই এমনি ধরনের কঠিন

পরীক্ষায় ইসলামী মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবার বা পরবর্তীযুগের লোকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে যাওয়া সম্ভব ছিলো। উল্লেখিত ঘটনাগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যার অস্তিত্ব রাসুলের জীবদ্দশায় সৃষ্টি হয়নি। সে সববিষয়ে সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ রেখে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিলো। তাদের আমলের বাস্তব নমুনা আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। সাহাবায়ে কেরামগণ এসব ব্যাপারে কি অপূর্ব যোগ্যতা ও ঐকান্তিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাসের পর্যালোচনার অধ্যায়ে পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারবেন। হাদিসে এরসাদ হয়েছে,

ما انا عليه و اصحابي ، الجماعة السواد الاعظم.

(বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সরল ও সোজা পথ সেটাই, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবারা অবস্থান করছি, তারা হলো আল জামায়াত- তারা মহান গোষ্ঠী।)

এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী যে হেদায়াত প্রাপ্ত দলের কথা বলেছেন, তাকে 'আল জামায়াত' বা 'আহলে সুন্নাতুল জামায়াত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দলের চূড়ান্ত গঠন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে মানদন্ড করা হয়েছে। পরবর্তীযুগে বিভিন্ন কোন্দল ও ফিতনার মধ্যে সাহাবারা সামষ্টিকভাবে যে মত ও পথে অবিচল থেকেছেন বা তারা দ্বীন ইসলামের ও শরীয়তের যে মর্ম গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন সেটাই হক পথ। ঐ পথে ও মতে সংঘবদ্ধ জামাতকে 'আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত' বলে আখ্যায়িত করে মহান গোষ্ঠী বলা হয়েছে। এই মহান দলের রূপরেখা রাসুলেপাকের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামদের জীবনেই গড়ে উঠেছিলো।

যারা পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরামদের এই মর্যাদা অস্বীকার করবে বা তাদেরকে হিদায়াতের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে, তারা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। "কোরআন ও হাদিসই হেদায়াতের উৎস" শুধু এই কথাটা মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং কোরআন ও হাদিসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করাই হলো আসল কাজ। এই লক্ষ্যেই সাহাবাদের অনুসরণ।

বিশিষ্ট ইমাম মাতরফ বিন শেইখর তার মজলিশে সাহাবায়ে কেরামদের মতামতকে সবার্ধিক গুরুত্ব দিতেন। একজন তাকে শুধু কোরআনের ভিত্তিতে আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন, তিনি জবাবে বললেন,

و الله ما نريد بالقرآن بدلا و لكن نريد من هو اعلم بالقرآن -(আল্লাহর শপথ, আমরা কোরআনের বদল চাই না, কিন্তু এমন ব্যক্তিদের মতামতকে অবহেলা করতে পারি না। যারা কোরআনকে সবচেয়ে বেশী জানেন) অর্থাৎ সাহাবাদের মতামত সামনে রেখেই কোরআনের মর্ম বের করতে হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তার কিতাব)منهاج السنة(তে ইমাম শায়াবীর একটা মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, "ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কারা?" তারা জবাব দিলো, "হযরত মুসার আসহাব" অতঃপর হযরত ইসা (সাঃ) এর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক করা, তার জবাব দিলো, হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথীরা)حوارى(সর্বশেষে যখন উম্মতে মুহম্মদীর বিভ্রান্ত লোকদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের উম্মতের সবচেয়ে খারাপ লোক কারা, তারা জবাব দিলো, 'আসহাবে মুহম্মদ' (সাহাবায়ে কেরামগণ) উম্মতে মুহম্মদীকে সাহাবায়ে কেরামদের জন্যে দোয়া করতে নির্দেশ দেয়া হলো, আর তারা করলো ভর্ৎসনা ও গালাগালী।"

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামদেরকে হকের মানদন্ড হিসেবে কবুল না করার ফলেই বিভেদের সুত্রপাত ও পরিণতিতে গোমরাহী। সাহাবায়ে কেরামদের আকিদা ওআমলের সাথে আমাদের আকিদা ও আমলের মূল্যায়ন করলেই বিভেদের অনেক পথ পরিহার করা যায়।

মুজাদ্দিদে দ্বীনের ভূমিকা:

فتح البارى গ্রন্থে ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী এই বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদে দ্বীনের আগমন-সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে তাজদীদে দ্বীন বা ইসলামী রেঁনেসার দায়ীত্ব আঞ্জাম দেবার জন্যে কোন একজন ব্যক্তি হওয়া জরুরী নয়, বরং হতে পারে এই দায়িত্ব কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে একটা দল বা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় আঞ্জাম পাবে। সে ক্ষেত্রে এই দল বা গোষ্ঠীকে তাজদীদ বা রেঁনেসার বলা যাবে। আবার মুজাদ্দিদ হিসেবে কোন ব্যক্তি বা দলকে ঘোষণা দেয়া বা স্বীকৃতি দেয়াও শর্ত নয়। আসল কথা হলো, এই তাজদীদের কাজ মুসলিম উম্মাহয় চালু থাকবে। এটা কোন পদবী বা দ্বীনি পরিচিতি নয়। কোন কোন ব্যক্তির জন্যে এই স্বীকৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এর অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণই শুধু মুজাদ্দিদ। সব দ্বীনি কাজ পৃথিবীতে স্বীকৃতি পায় না বা এই স্বীকৃতির জন্য কোন ইলাহী

ব্যবস্থা নেই। ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী উম্মতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রথম মুজাদ্দিদ হিসাবে হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর এই তাজদীদের কাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধমে আঞ্জাম পেয়েছে এবং এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। ভারতীয় উপমহাদেশে হযরত আহমদ সারহন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা ইসলামের দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

তাযদিদে দ্বীন বা ইসলামে রেঁনেসার এই মহান কাজ ইসলামের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সাথে আঞ্জাম পেয়েছে। একটি উৎসের আকিদা ও আমল যুগে যুগে একই ধারায়ও প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হবে। মুসলিম উম্মাহর রেঁনেসার কাজে এই পরম্পরা পরিলক্ষিত হয়েছে। আজও এই মহান দায়িত্ব যথা নিয়মে আঞ্জাম পাচ্ছে ও ভবিষ্যতেও পাবে।

ইসলামী জীবন ধারার কোনও দিক যখন বিকৃতির শিকার হয়, বা যখন জীবনের প্রতিটি দিকও বিভাগে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই তাযদীদে দ্বীনের কাজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বা যারাই এ পথে এগিয়ে আসেন তারা উম্মতের জন্য এই মহান কাজটিই আঞ্জাম দেন।

ওয়াখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সমাপ্ত

রেফারেন্স :

1.মুসলিম উম্মাহ'র বিভেদ ও ঐক্য(মাওলানা আবদুল হাই ফারুকী)

২.মুসলিম উম্মহ'র এক্য(ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ)

৩.মুসলিম উম্মহ'র এক্য(ডা.জাকির নায়েক)

৪.গুগোল

৫.ইসলামি জিন্দেগি এ্যাপ, কুরআন এ্যাপ